মহানায়ক

বরেন বসু

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৬০

প্রকাশক

নরেন মল্লিক

সাধারণ পাবলিশার্স

৭, ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা ১৭

মুদ্রাকর

শ্রীপ্রবোধ কুমার সিংহ

মহানন্দ প্রিন্টিং হাউস

৭, শ্বক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫

প্রচ্ছদপট

নরেন মল্লিক

দাম—তিন টাকা

দরজার ওপর দুম্‌দাম্‌ শব্দ! কে যেন বিরতিহীন কিল মেরে চলেছে—

আচমকা ঘুম ভেঙে যায় অনাদির। দরজাটা ধরে রীতিমত ঝাঁকানি দিচ্ছে! বুঝিবা দরজাটা ভেঙেই ফেলবে! তড়াক্‌ করে অনাদি বিছানার ওপর উঠে বসে। কে? কে? বলে চিৎকার করে উঠতে যায় কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। গল্‌গল করে ঘামছে সমস্ত শরীর, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত!

হঠাৎ থেমে যায় দরজার ওপর প্রচণ্ড সেই ধাক্কাধাক্কি। মুখের ঘাম হাতের চেটোয় মুছে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে অনাদি। চাঁদের আলো রয়েছে তার বিছানাটা জুড়ে—পশ্চিমে ঢলে পড়া চাঁদ। তাহলে রাত তো প্রায় কাবার—চারটে তো বটেই! কান খাড়া করে থাকে অনাদি, তক্তাপোষের ওপর থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দেয়। নড়বড়ে তক্তাপোষটা অযথা খানিকটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজার ওপর শব্দ, খড়খড় করে একটানা কড়ানাড়া। টপ্‌ করে পা দুটো গুটিয়ে নেয় অনাদি। ঠিক করে ফেলে, অত সহজে দরজা খুলে দেওয়া ঠিক হবে না। অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ চাতালের ওপর আর কথার ফিস্‌ফাস্‌! ভেবে পায়না অনাদি, কলকাতা শহরে শেষ রাত্তিরে কড়া নেড়ে গেরস্তকে জাগিয়ে ডাকাতি আবার কবে থেকে সুরু হল! ডাকাত মনে হতেই গ্রাম্য অভ্যেসটা অনাদিকে পেয়ে বসে। চকিতের মধ্যে সমস্ত ঘরটায় ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ইচ্ছে হয়, একগাছা লাঠি বাগিয়ে ধরে দাঁড়ায় দরজার আড়ালে চুপে চুপে দরজাটা খুলে দিয়ে। তারপর একটা একটা করে মাথা যেই না গলাবে ঘরের মধ্যে, অমনি এক এক ঘায়ে একটা একটা করে খুলি দেবে উড়িয়ে।

কিন্তু কলকাতা শহরে কে আর কবে লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘরে শুয়েছে! বড় জোর মাঝে মাঝে জানলা বন্ধ রাখতে হয় ছিঁচকে চোরের ভয়ে। কিন্তু এরা আবার কি জাতের ডাকাত! সত্যিই যেন একটু ভাবনা হচ্ছে অনাদির, ঘরে নেই একটা হাতিয়ার আর পল্লীগ্রামও নয় যে চিৎকার করে গ্রামশুদ্ধ লোক জড় করে ফেলবে। কিন্তু সড়কি, বল্লম নিয়ে তো শহরে ডাকাতি হয়না! এখানে সামনে এসে দাঁড়ায় রিভল্‌ভার হাতে স্বদেশী ডাকাত!

হাসি পায় অনাদির, স্বদেশী ডাকাত কিনা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে! আহা, বেচারীরা বোধহয় ভুল করেছে। শুধু তার ঘরে কেন, নিচের তলায় কারও ঘরে বোধহয় একটা ফুটো কাঁসার ঘটিও পাবেনা। তবে দোতলার শ্রীমন্তবাবুর ওখানে সোনাদানা কিছু পাওয়া যেতে পারে। শ্রীমন্তবাবুর স্ত্রী যখন সেজেগুজে বেরোন, তখন তো মনে হয় ভদ্রলোকের বেশ দু'পয়সা আছে।

বিছানা থেকে নেমে হেঁটে যায় অনাদি সুইচ্‌টার দিকে। ঠাণ্ডা সুইচটায় হাত পড়তে তার চমক ভাঙে, একেবারে খালিহাতে দরজাটা খুলে দেবে?

আবার দরজা ঠেলাঠেলি আর সঙ্গে সঙ্গে আস্ফালন, "খুলুন না মশাই দরজাটা—"

সুইচ থেকে অনাদি হাত সরিয়ে নেয়। কেমন যেন খট্‌কা লাগে, ঠিক যেন ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না, না দেশী—না স্বদেশী! না, দরজা সে কিছুতেই খুলবে না। সকাল হলেই লোক জড় হবে, গঙ্গার ধারে শুরকী কলে যখন দলে দলে লোক যাবে এই রাস্তা দিয়ে, তখন ব্যবস্থা একটা আপ্‌সেই হয়ে যাবে। কিন্তু খোঁকা লাগে অনাদির, যে লোকের ভরসায় সে সকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে, সে লোকতো রয়েছে এই বাড়ীতেই। নিচের তলায় রয়েছেন সোমেনবাবু জোয়ান জোয়ান

ভাইপো সমেত জন আষ্টেক, রয়েছেন নির্মলবাবু আর তাঁর সংসার তার পাশের ঘরেই, আরও রয়েছেন সস্ত্রীক রঞ্জণবাবু তার দরজার ঠিক উল্টো দিকে! অবশ্য শ্রীমন্তবাবুর কথা আলাদা, ভদ্রলোক একে বড়লোক তায় বাড়ীওয়ালা। আর জোটেও কি ছাই যত লাভের ব্যাপার ওদেরই কপালে! একশো কুড়ি টাকায় পুরো বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে একশো টাকা তুলছেন নিচের তলা থেকে ঘরে ঘরে ভাড়া বসিয়ে, আর কুড়ি টাকায় তিনি থাকেন সমস্ত দোতলাটা জুড়ে!

ঘরের বাইরে থেকে দরজা ভেদ করে কয়েকটা কথা ছিটকে আসে অনাদির কানে। তারই মাঝখান থেকে কে একজন বিরক্তিতে গজগজ করে ওঠে, "এ তো দেখছি ভ্যালা আপদ হল মশাই—দরজা খোলেনা কেন!"

আর একজন অতি অমায়িক ভাবে প্রশ্ন করছেন, "হ্যাঁ মশাই, অনাদিবাবু এই ঘরে থাকেন তো?"

"থাকেন বৈকি—" রঞ্জণবাবুর গলার স্বর বলেই অনাদির মনে হয়।

"তা, দয়া করে আপনি একটু ডেকে দিন না—" সেই অমায়িক কণ্ঠস্বর।

"আমার তো কোন দরকার নেই তাঁকে! দরকার আপনাদের, আপনারাই ডাকুন—" রঞ্জণবাবুর কথায় বেশ খানিকটা ঝাঁঝ! তার পরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

মুহূর্তের স্তব্ধতার ফাঁকে অনাদিকে ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে দেওয়ার আগেই আবার সেই বিরক্তিকর গুঞ্জণ, "নাঃ, এতো বড় জ্বালালে দেখছি!" সখেদ উক্তি তখনই আবার রূপান্তরিত হয় কড়া হুকুমে, "হাবিলদার, বাড়ী ঘেরাও কর—"

নখ লেগে ফেটে যাওয়া ফানুষের মত অনাদি চুপসে যেতে থাকে। সেই অবসরে অনেকগুলো নালপাগান জুতো তড়বড় করে নেমে যায়

চাতাল থেকে, খট্খট্ ঠক্ঠক্ আওয়াজ করতে করতে চলে যায় ভেতর বাড়ীর দিকে। যে ঘাম অনাদির শুকিয়ে গিয়েছিল স্বদেশী ডাকাত মনে করার পর, সেই ঘামে আবার ভিজে উঠছে সমস্ত শরীর। তাহলে, এরা পুলিশ!

অনাদির কাছে এ যেন এক নতুন অনুভূতি, একবছর আগে যখন তার চাকরী চলে গিয়েছিল তখনও সে এমনভাবে ফুরিয়ে যায়নি! দরজা খুলবে কি খুলবে না, সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা জাগছে না অনাদির। দরজা তো খুলতেই হবে। ওরা যে পুলিশ! ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে!

শিথিল হাতখানা ধীরে ধীরে উঠে আসে খিলটার ওপর। শেষবারের মত অনাদি ঘরটার দিকে তাকিয়ে নেয়। চাঁদের আলোয় বিছানাটা তার ভেসে যাচ্ছে, খানিকটা এসে পড়েছে ধবধবে সাদা দেয়ালটায়। দু'মাস ধরে শ্রীমন্তবাবুর কাছে আবেদন নিবেদন করে মাত্র সপ্তাহখানেক আগে ঘরটা চুণকাম করিয়ে নিয়েছে।

খিল্টা খুলতে গিয়েও থমকে যায় অনাদি আরও একবার। পুলিশই বা কেন? কেমন যেন আলগোছে মনে পড়ে যায় তার অফিসের কেষ্টবাবুর কথা। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'এখন তো চলেছে পুলিশরাজ।' কেষ্টবাবু একথা বলতে পারেন—তিনি কমিউনিষ্ট। কিন্তু! ভ্রু দুটো কুঁচকে ওঠে অনাদির। তাকেও কি কমিউনিষ্ট মনে করে ধরতে এসেছি নাকি! হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে তার। এরা কি ক্ষেপে গেল নাকি! আজব এক চীজ এই পুলিশেরা! তাকেও যদি কমিউনিষ্ট মনে করে থাকে, তাহলে যা ঠকবে ব্যাটারা! ছেলেমানুষি খুশীর হাসিতে খুঁক্খুঁক্ করে ওঠে অনাদি।

চকিতে মনে পড়ে যায় অনাদির তারই ছেলেবেলার একটী ঘটনা। ওঃ কি জব্দটাই না করেছিল একটা স্পাইকে সে আর অসীমদা!

লোকটা তাদের পিছু নিয়েছিল। নজর এড়ায়নি অসীমদার। গতি মন্থর করে নিয়ে অসীমদা বললেন, 'অনাদি, তুমি এগিয়ে গিয়ে রাধুদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে থাকবে দরজার আড়ালে, আমি কিন্তু সোজা এগিয়ে যাব। তুমি নজর রাখবে ওই টিকটিকিটার ওপর। যেই না ব্যাটা দরজা পার হবে, অমনি তুমি বেরিয়ে পড়ে ব্যাটাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে চিৎকার জুড়ে দেবে। তারপর আমি ব্যাবস্থা করবখন।' অসীমদার কথামত ধরেছিল সে লোকটাকে আর চিৎকারে তো গগন ফাটানর জোগাড়। অসীমদা দৌড়ে এসে লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে উঠলেন, 'কি রকম লোক মশাই আপনি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছেন?' লোকজন জড় হয়ে গেল প্রচুর আর ব্যবস্থা তারাই করল, উত্তম-মধ্যম হল বেশ খানিকটা। কিন্তু বেচারী মুখ ফুটে বলতেও পারল না, কি কাজে এসে কি ব্যাপারে গেল ফেঁসে!

হাসিতে খল্‌খলিয়ে ওঠে অনাদির মনটা। আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করে ওঠে, 'এই তো মুরদ বাপু তোমাদের, আর লোক খুঁজে পেলে না, ধরতে এসেছ আমাকে! আমি তো বাপু মরা ঘোড়া।' এ অনুশোচনা আজও অনাদির হয়। সে সময়ে বড়মামা যদি অমন করে বাধা না দিতেন আর মা যদি অত কান্নাকাটি না করতেন, তা হলে কবে সে ফাঁসিকাঠে ঝুলে যেত! তার অতীত ইতিহাসকে সগৌরবে আজও স্মরণ করে অনাদি।

কড়কড় করে বেজে ওঠে কড়া, লোকটা এবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। দরজার খাঁজে মুখ লাগিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে বাইরে থেকে, "ভাল চাও তো দরজা খোল বলছি—"

খিল্‌টা খুলে নামিয়ে রাখার আর তর্‌ সইল না, দরজা ঠেলে সবেগে ঢুকে পড়লেন ধড়াচূড়া আঁটা ইন্সপেক্টর সাহেব বাঁ হাতে টর্চ জ্বেলে আর ডান হাতে রিভলভার বাগিয়ে। আচম্বিতে পেছিয়ে গেল অনাদি।

এক পা পেছু হেঁটে হাত দুটো ঝট্ করে তুলে ধরল মাথার ওপর। আমেরিকান খুনে-ডাকাতের ছবি দেখার দৌলতে ও কায়দাটা আপনা হতেই রপ্ত হয়ে গেছে।

অনাদির ভাবসাব দেখে খুঁকখুঁক করে হেসে ওঠেন থানা ইন্সপেক্টর অবনীবাবু, "ঘরের মধ্যে এতক্ষণ করছিলেন কি?"

প্রশ্নটায় হতচকিত হয়ে যায় অনাদি। তার নিজের ঘরে মাঝ-রাত্তিরে সে কি করছিল, তারও কৈফিয়ৎ তাকে দিতে হবে! সেই একই অবস্থায় মাথার ওপর হাত তুলে রেখে অনাদি আড়ষ্টভাবে বললে, "এ যে আপনারা এসেছেন, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"ঠিক তো, না অন্য কিছু—" চোখ কুঁচকে অনাদির আপাদমস্তক দেখে নেন অবনীবাবু।

টর্চের তীব্র আলোর সামনে অনাদির ঘর্মাক্ত মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না, কেবল মাথাটা উঠল ঈষৎ দুলে। অবনীবাবু অনাদির মুখ থেকে চোখ না সরিয়েই বলে উঠলেন, "ঘরে তো ইলেকৃট্রিক্ আছে—আলো জ্বালেন নি কেন?" প্রচণ্ড এই ধমকের উত্তরে অনাদির গলাটা কেবল থর্থর্ করে কেঁপে ওঠে। "দরোয়াজা—বাত্তি জ্বালাও—" অবনীবাবুর জলদ গম্ভীর হুকুমে ঘরটা যেন গম্গম্ করে ওঠে।

দপ্ করে ঘরের আলোটা উঠল জ্বলে। অবনীবাবু টর্চ নিভিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "তাহলে ক্ষিতিশবাবু, এবার আপনার কাজ সুরু করুন।"

একটি মুহূর্তের অবসর। অবনীবাবুর চোখ গেছে সরে অনাদির ওপর থেকে। সেই অবসরে প্রবল এক ইচ্ছা পেয়ে বসে অনাদিকে। আচ্ছা, যদি ঝপ্ করে বসে পড়ে অবনীবাবুর কব্জিতে একটা লাথি মারে! তাহলে রিভলভারটা নিশ্চয়ই একটা ডিগবাজি খেয়ে তার হাতের ওপর এসে পড়বে। যুযুৎসুর প্যাঁচটা বিদ্যুতের মত খেলে

যায় তার মাথার মধ্যে। চোখের ওপর ভেসে ওঠে, ধড়াচুড়া আঁটা অবনীবাবু কেমন ভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছেন মেঝের ওপর। হাত দুটো নিস্‌পিস্ আর পা দুটো সুড়সুড় করে উঠলেও, জোর করে নিজেকে রুখে ধরে অনাদি। অসীমদার কাছ থেকে যুযুৎসু শিখে এসেই চিনুর ওপর প্যাচ্ ফলানর ফলে মামাদের কাছ থেকে চাঁদা করে মার খাওয়ার কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়। আর মনটাও ব্যথিত হয়ে ওঠে, পড়ে গিয়ে চিনুর কপাল কেটে দর্‌দর্ করে রক্ত পড়ার দৃশ্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠতে।

অবনীবাবুর পেছন থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এস্, বি, ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশবাবু খানিকটা এগিয়ে এসে অনাদির আপাদমস্তক একবার নিরিক্ষণ করে নেন। তারপর অবনাবাবুকে বলেন, "আর কেন অবনীবাবু—হাত দুটো ওঁকে নামাতে বলুন।"

হঠাৎ যেন চমকে ওঠেন অবনীবাবু, এ কথাটা তাঁর আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। আশ্বাস দেওয়ার স্বরে অনাদিকে বললেন, "থাক্, হাত তোলার আর দরকার হবে না। আপনাদের ভয়েইতো আমরা তটস্থ! যে রকম মার্-মার্ কাট্-কাট্ রব তুলেছেন আপনারা—" কথাটাকে যেন বেশ মনের মতন করে গুছিয়ে বলতে পেরেছেন, এমনই একটা পরিতৃপ্তির শব্দ করে বললেন, "জানেন ক্ষিতিশবাবু, ভয় ছিল ওই টেররিষ্টদের—" একটুখানি চুপ করে থেকে হয়তো স্মরণ করে নেন পুরণো দিনের কথা, তারপর মমতা বিগলিত স্বরে বলে যান, "আর জানবেনই বা কেমন করে, আপনারা তো সব এই সেদিন ঢুকেছেন। জানের পরোয়া কি মশাই এতটুকুও ছিল না ওই ছেলেগুলোর!"

অবনীবাবুর চাকরীটা হয়েছিল চব্বিশ সনে—তখন তিনি যুবক। একুশ সনের অসহযোগ আন্দোলনের অসংলগ্ন পরিসমাপ্তি বিভ্রান্ত যুবক অবনীকে আবার সরকারী কলেজেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল—সঙ্কোচে,

লজ্জায় মাথা নিচু করে সেদিন সে কলেজের গেট পার হয়েছিল। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আরও অনেকে মাথা নিচু করে ফিরে এসে বসল কলেজের বেঞ্চে। যুবক অবনী সেদিন মনে প্রাণে চেয়েছিল বৃটীশের উচ্ছেদ—সংগ্রামের জন্য সে-ও ছিল প্রস্তুত। কিন্তু সংগ্রামই হল তখন ধিকৃত! বি, এ, পাশ করে যুবক অবনী চাকরী করা ছাড়া আর কোন রাস্তা খুঁজে পায়নি। আর তখন সরকারী চাকরী মানেই পুলিশ ট্রেণিং—ওই একটি মাত্র রাস্তাই ছিল খোলা। যুবক অবনী তখনও ভেবেছিল, পুলিশ হয়েও তো দেশের মানুষকে সাহায্য করা যেতে পারে! কিন্তু—

টেক্কা মারার চালে মুচকে হেসে ক্ষিতিশবাবু বললেন, "কিন্তু এঁরা আরও সাংঘাতিক চীজ অবনীবাবু। তারা ছিল দু'চারজন, আর এঁরা দেশশুদ্ধ লোককে টেররিষ্ট বানাতে চান।"

ভ্রু দুটো অনাদির কুঁচকে ওঠে। দু'চারজন টেররিষ্ট আর দেশশুদ্ধ লোক টেররিষ্ট! তারা আর এঁরা! এসব কথা উঠছেই বা কেন! সে সব তো শেষ হয়ে গেছে তার বারো বছর বয়সে!

সে ছিল একটা যুগ! চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর পড়েছে ছড়িয়ে, ওদিকে চলেছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, তারই ফাঁকে হিজলী জেলে মারা গেল সন্তোষ মিত্তির পুলিশের গুলিতে—বাঙলা দেশে তখন বহে চলেছে ঝ'ড়ো হাওয়া। তেমনি সময়ে অনাদি গ্রামের গুপ্ত সমিতির কিছু কিছু কাজ করছে, মানে অসীমদার টুকিটাকি ফাই-ফরমাস্ খাটছে। অসীমদা বললেন, 'চিঠিখানা মধুদার হাতে পৌঁছে দেবে অশথতলার পুকুর পাড়ে ঠিক বেলা পাঁচটার সময়।' অনাদি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটার সময়ে পেয়েছে মধুদাকে অশথতলার শান বাঁধান ঘাটে। অনাদিকে দেখেই মধুদা হাত বাড়িয়েছেন, 'দাও চিঠিখানা।' ছেলেমানুষ অনাদির মনে জেগেছে প্রচণ্ড বিস্ময়, মধুদা সবই জানেন

কি করে! অথচ তিনি গ্রাম থেকে ফেরার—পুলিশের হুলিয়া তখনও ঝুলছে তাঁর ওপর!

সে এক অদ্ভুত যুগ! এত গোপনতা, এত হুশিয়ারী, তবুও পুলিশে সব খবরই পেয়ে যায়। অনাদির চলাফেরাও পুলিশের নজরে পড়ল। বারোবছরের ছেলেকে সায়েস্তা করার অদ্ভুত কৌশল জানত পুলিশেরা। ডেকে পাঠালে তার বড়মামাকে থানায়। নিরিহ, ভালোমানুষ, কারবারী লোক বড়মামা থানা থেকে ফিরলেন পাগলের মত। পাড়ার যত রাজনৈতিক কর্মি, তাদের বাপ-চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে ঢুকলেন চণ্ডিমণ্ডপে। সে কি মেজাজ তাঁর, মা-কে তখনই বুঝি বার করে দেন বাড়ী থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে! সমস্ত ব্যাপারটা শুনে মা তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন পড়ার ঘরে, হাতে ছিল তাঁর উঠান ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটা। তাই দিয়েই চলল প্রহার তার ওপর। বড়মামিমা সেদিন মা-কে না ধরলে, হয়তো তিনি তাকে মেরেই ফেলতেন। শেষে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সামনে মায়ের পা ছুঁয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, 'দেশের কাজ'-এর ত্রিসীমানায় সে আর কোন দিন যাবে না।

রিভলভারটা নামিয়ে নিয়েঅবনীবাবু ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারী করতে থাকেন, ঘরের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মেরে অনাদির সামনে এসে বললেন, "এ ঘরটা আমরা সার্চ করব।"

অন্যমনস্ক অবস্থায় অনাদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, "কেন!"

হো হো করে হেসে ওঠেন অবনীবাবু, দমকে দমকে হাসি যেন আর থামতে চায় না। সেই হাসির লহরার মাঝেমাঝেই বলে ওঠেন, "জিজ্ঞেস করছেন—কেন? ভাগ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, না হলে বৃটীশ আমলে এ প্রশ্নের জবাব কি ভাবে পেতেন, জানেন?"

প্রত্যক্ষভাবে জানা না থাকলেও, অনাদি জানে। মনে আছে আজও, তাদের গ্রামে পুলিশের হানা অসীমদাকে ধরার জন্যে। সেও

বোধহয় এমনই এক বিরাট বাহিনী রীতিমত রণসাজে সেজে এসে হাজির হল অসীমদার বাড়ী। অসীমদার বাবা দেখতে চেয়েছিলেন সার্চ-ওয়ারাণ্ট। তার উত্তরে পুলিশ বাহাদুর অসীমদার বুড়ো বাবার পেটে বুটশুদ্ধ লাথি মেরে বলেছিল, 'হিয়াস' ইওর্ সার্চ-ওয়ারাণ্ট।'

সেই ইঙ্গিতই কি অবনীবাবু করতে চাইছেন? মুখ তুলে অনাদি বারেক চেয়ে দেখে অবনীবাবুর মুখের দিকে। চোখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, "তাহলে সার্চ করুন। আমায় বলার তো কোন দরকার নেই।"

ক্ষিতিশবাবু অনাদির শেল্‌ফ্‌টার সামনে থেকে ঝট্ করে সরে এসে বলে ওঠেন, "সে সব দিনকাল কি আর আছে মশাই—" মস্ত বড় একটা কাগজ অনাদির সামনে মেলে ধরে বললেন, "এই দেখুন সার্চ-ওয়ারাণ্ট। জানেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর কোন মানুষের নাগরিক অধিকারে জাতীয় সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করে না—" কথা শেষ করেই কাগজটা তুলে ধরেন একেবারে অনাদির নাকের ডগায়।

চোখ দুটো কুঁচকে ওঠে অনাদির। মিটমিট্ করে চেয়ে থাকে ক্ষিতিশবাবুর দিকে। অবাক লাগে তার, স্বাধীনতা কি এরাও পেয়েছে নাকি।

কাগজটাকে হেঁচকা মেরে নামিয়ে নিয়ে ক্ষিতিশবাবু বলেন, "তাহলে আমরা সার্চ সুরু করতে পারি?"

বিরক্ত হয়ে ওঠে অনাদি। সমস্ত ব্যাপারটা রসিকতা না কি! বললে, "সে কথা জিজ্ঞেস করার কি কোন দরকার আছে!"

বিস্ময়ে ফেটে পড়েন অবনীবাবু, "বলেন কি! আপনার অনুমতি ছাড়া ঘরেই ঢুকতে পারি না। হেঁ হেঁ, সে সব দিনকাল এখন আর নেই মশাই—"

মুখটা ঝট্ করে ফিরিয়ে নেয় অনাদি। রাগে যেন তার হাত নিস্‌-পিস্ করছে, ইচ্ছে হচ্ছে অবনীবাবুর ওই ফুলোফুলো গালে ঠাস্ করে

এক চড় বসিয়ে দেয়। ঠেলেঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে কিনা 'আপনার অনুমতি ছাড়া ঘরেই ঢুকতে পারি না' !

ক্ষিতিশবাবু নাগরিক অধিকারের আরও একটা দফা বাতলে দেন, "তা ছাড়া সার্চ করতে দেওয়ার আগে আপনিও আমাদের সার্চ করতে পারেন—এ অধিকার আপনার আছে।"

চকিতের মধ্যে অনাদির মনে পড়ে যায় অসীমদাকে যেবারে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সেবারকার কথা। সারা বাড়ীটা ওলটপালট করে খুঁজেও বেরুল না একটি পেন্সিল কাটা ছুরি, আর ভোজবাজির মত বেরিয়ে পড়ল কাঠের গাদা থেকে নতুন ঝক্‌ঝকে একটা রিভলভার !

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনাদি ক্ষিতিশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, এরকম কোন মতলব আছে নাকি ওদের। হাত, পা, কেমন যেন কাঁপতে থাকে। এমন অবস্থায় সে কি করতে পারে। চিৎকার করে মরে গেলেও যে লোক জড় হবে না ! এরা যে পুলিশ !

দুই

সার্চ সুরু হল। ক্ষিতিশবাবু চুড়িদার পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে নিলেন। অবনীবাবু দাঁড়ালেন দরজার গোড়ায় রিভল্‌ভার খুলে। দুটী লাল-পাগড়ী পুলিশ চোখের পলকে বিছানা ফেললে উল্টে, তক্তাপোষের তলা থেকে সুটকেশটা টেনে বার করলে হিড়হিড় করে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরখানাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিলে। তারপর বেচারিদের আর করবার কিছু নেই—এমন জিনিষ আর অনাদির ঘরে নেই যা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ দক্ষযজ্ঞ চালাতে পারে। দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীবাবু হুকুম দিলেন, "তুমলোগ বহার যাও—"

স্যুটকেশ খুলে ক্ষিতিশবাবু তার মধ্যে থেকে প্রতিটি জামা কাপড়ের ভাঁজ খুলে, পকেট হাতড়ে টান মেরে ফেলতে লাগলেন মেঝের ওপর। স্যুটকেশ, বিছানা, আলনার জামাকাপড়, তক্তাপোষের তলা, সবই দেখলেন গভীর অভিনিবেশে। এরপর যেন আর কিছু দেখবার নেই। সন্তুষ্ট হতে পারেন না ক্ষিতিশবাবু, ঘাড় তুলে অনাদির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন, "এই-ই আপনার সমস্ত জিনিষ?"

অনাদি বললে, "হ্যাঁ।"

"আপনার ঘর কি কেবল এইটাই?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার কোন আত্মীয় স্বজন এ বাড়ীতে থাকেন?"

"না।"

"তাঁরা কোথায় থাকেন?"

"দেশে।"

"তাহলে কোলকাতায় আপনি একলাই থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"সামান্য একটু উষ্মার ছোঁয়াচ লাগে অনাদির স্বরে।

"এ বাড়ীতে কার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বেশী?"

"কারও সঙ্গে না।"

"এ বাড়ীতে আর কোন কমিউনিষ্ট থাকে?"

চমকে ওঠে অনাদি। তাকে কি তাহলে সত্যি সত্যিই কমিউনিষ্ট মনে করেছে! শির্‌শির্ করে একটা কাঁপন খেলে যায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। আজকের দিনে কমিউনিষ্ট হওয়া আর পুলিশের হাতে পড়ার মানে কি, তা সে বোঝে। তাহলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এরা এসেছে! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনাদি ক্ষণেক ভাবে, দূর, তা কখনও হয়। এরা কি এতই গর্দভ! হেসে হাল্কা মনেই অনাদি বলে, "কিন্তু আমি তো কমিউনিষ্ট নই—আপনারা বোধহয় ভুল করেছেন!"

ক্ষিতিশবাবু হঠাৎযেন ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, "ও কথা তো আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি—যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দিন।"

ধমকের স্বর, দরজার গোড়ায় ধড়াচূড়া আঁটা পুলিশ ইন্সপেক্টর, সামনের চাতালে লালপাগড়ীর পাহারা—সব কিছুই কেমন যেন আজব বলে মনে হচ্ছে অনাদির। কেনই বা এরা এসেছে, কিইবা এরা চায়, এদের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কি, আর এরাই বা কারা, প্রশ্নগুলো যেন অবাক করে ফেলছে তাকে! সেই বিস্ময়েরই স্বরে অনাদি বলে ওঠে, "কিন্তু আপনারাই বা হঠাৎ এমন উড়ে এসে জুড়ে বসে চোখ রাঙাচ্ছেন কেন?"

এবার এগিয়ে এলেন অবনীবাবু অনাদির কাছে, "কোন কথার কি জবাব দিচ্ছেন অনাদিবাবু। ক্ষিতিশবাবু যা জিজ্ঞেস করছেন তার উত্তরে একটা 'হ্যাঁ' কি 'না' বললেই তো চুকে যায়। অকারণে কথা বাড়িয়ে লাভ কি!"

অনাদিরও মনে হয়, অবনীবাবুর কথাটাই ঠিক—চটুপট্ উত্তর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদেয় করা যায়। বললে, "আমি জানিনা।"

প্রশ্নের পালা শেষ করে ক্ষিতিশবাবু আবার কাজে মন দিলেন। অবনীবাবুও হঠাৎ যেন আশ্বস্ত হয়ে উঠে, আড়ামোড়া ভেঙে সরব একটা হাই তোলেন। অনাদি ভেবে ঠিক করতে পারেনা, তার এই জবাবে কোন কিছু স্থিরিকৃত হয়ে গেল কিনা!

ভোর হয়ে আসছে। অবনীবাবুর বিরাট বপুর আশপাশ দিয়ে অনাদি দেখতে পাচ্ছে চাতালটার ওপর অন্ধকার আসছে পাতলা হয়ে। ওই খানটায় এসে পড়ে সূর্যের প্রথম আলো। ইচ্ছে হয়, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাড়ায় সূর্যের মুখোমুখি। এক পা এগিয়েও যায়, কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীবাবু, হাতে তাঁর রিভলভার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি তক্তাপোষটার ধারে, তারপর বসে পড়ে ধীরে ধীরে ক্লান্ত শরীরের

বোঝাটা নিয়ে। অনাদির দেখাদেখি অবনীবাবুও দরজা থেকে সরে এসে তক্তাপোষের ওপর বসে পড়েন ধপাস্ করে। হোলস্টারের মধ্যে রিভল্‌ভারটা রাখতে রাখতে বললেন, "একটু বসলাম কিন্তু মশাই, আর রিভল্‌ভারটা রেখে দিলুম। দেখবেন—"

হঠাৎ অনাদির মনে হয়, এতক্ষণে যেন অবনীবাবুর সাদৃশ্য সে খুঁজে পেয়েছে। সেবার বড়মামা বাড়ীর চাকরটাকে প্রচণ্ড মার লাগালেন কি একটা কারণে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন, হাতের কব্জিতে তাঁর হয়েছে বিষম ব্যথা। সে কি রাগ বড়মামার! চাকর-বাকরের পিঠ অত শক্ত হবে কেন! অবনীবাবুর আশঙ্কাটাও যেন ঠিক বড়মামারই মতন। ওই অবস্থার মধ্যেও অনাদির হাসি পায়। হাসিমুখে বললে, "এমন রণসাজে সেজে এসেছেন—তবু ভয়!"

টুপি দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে অবনীবাবু বললেন, "তা, ভরসাটাই বা কি আপনাদের ওপর! বুঝলেন না মশাই, প্রাণটাতো আমার, চাকরীটা না হয় গভমেণ্ট দিয়েছে!"

ক্ষিতিশবাবু ততক্ষণে কেরোসিন কাঠের শেল্‌ফ্ থেকে বইগুলো পেড়ে ফেলেছেন। এক একখানা বই তুলে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওল্‌টাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করেন, "এই সমস্ত মস্কোর বই পেলেন কোথায়?" ভাবটা যেন এতক্ষণে মোক্ষম একটা কিছু পেয়েছেন।

মস্কোর বই আছে তিনখানা, স্তালিনের জীবনী, গোর্কির 'মা', আর সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস। বাকী বইগুলো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আধুনিক লেখকদেরও কয়েকখানা—ফুটপাথ থেকে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডে কেনা। বই, অনাদির নিজের খুব ভাল লাগে না—বই কিনে পয়সা অপচয় করার চেয়ে কাজের জিনিষ কিনতে পারলে সে খুশী হত। কিন্তু চিনু বই পড়ার জন্যে পাগল! কলকাতায় আসার পর যখনই

অনাদি দেশে যায়, চিণুর জন্যে খানকয়েক বই তাকে নিতেই হয়। চিণুর জন্যে বই কিনতে কিনতে, বই কেনাটা কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু মস্কোর বই! ওই কেষ্টবাবু! তখন চাকরীর ধান্দায় তাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছে হরদম্ ইউনিয়ন অফিসে, তারই এক ফাঁকে তিনি গছিয়ে দিয়েছিলেন সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসখানা এক টাকায়। শেল্‌ফে বইখানা রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অনাদির ভালই লেগেছিল—বেশ মানিয়েছিল শেলফের মাঝের তাকটা। তারপর সে নিজেই কিনেছিল স্টালিনের জীবনীখানা ন'আনায় আর গোর্কির 'মা' দেড় টাকায় সেকেণ্ডহ্যাণ্ডে।

ক্ষিতিশবাবুর প্রশ্নে অনাদির বিরক্তি জেগে ওঠে, সংক্ষেপে বললে, "কিনেছি—"

ঝট্ করে ঘুরে বসেন ক্ষিতিশবাবু, চোখের তারা দুটো নেচে ওঠে, "কিনেছেন! কোথা থেকে?"

অনাদির মনে হল, বোকামিরও একটা সীমা থাকা উচিত, কিন্তু এ লোকটার নির্বুদ্ধিতা বুঝি সীমাহীন! একটু ঝাঁঝ দিয়ে বললে, "দোকানে, বাজারে, রাস্তায় ঘাটে, কোথায় না পাওয়া যায়। একটু চোখ মেলে চললেই দেখতে পাবেন।"

মাঝখান থেকে অবনীবাবু টপ্ করে বলে ওঠেন, "ভারী সস্তা না? আচ্ছা, এত সস্তায় দেয় কি করে বলুন তো?"

অনাদি বললে, "দেবে না কেন। ওদের দেশে তো বড়লোক নেই আর কারখানার মালিকও নেই—সবই স্টেটের। কাজেই, দশহাত ঘুরে এক টাকার জিনিস দশ টাকা হয় না।"

অনাদির কথার মাঝখানেই ক্ষিতিশবাবু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করেন, "তাহলে এসব বই আপনি পড়েন?"

"পড়ি বৈকি—" তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয় অনাদি, "না হলে আর কিনেছি কেন!"

আবার অবনীবাবু মাঝখান থেকে মন্তব্য করে বসেন, "আর ক্ষিতিশবাবু, কার চোখেই বা হাত চাপা দেবেন! আর বলেন কেন, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হতে সুরু করেছে! আমার ছেলেটা, বুঝলেন, এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। সেদিন দেখি কি 'কমিউনিষ্ট এডুকেশন' বলে একটা বই কিনে এনেছে। আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত! বকাঝকা করে বইটাতো দিলুম উনানের মধ্যে। কিন্তু মশাই, সত্যি বলতে কি, কেমন যেন মায়া হল। বারো আনায় চামড়ার বাঁধাই ওইরকম চকচকে ঝকঝকে, সোনার জলে নাম লেখা ইয়া মোটা একখানা বই—" তর্জনি আর বুড়ো আঙুলটা ফাঁক করলেন প্রায় দু'ইঞ্চি, "আর আমাদের দেশে স্কুলের ছেলের বই কিনতে যান, দাম শুনলে আপনার পিলে চমকে যাবে—"

ক্ষিতিশবাবু বিরক্তি লুকাবার কোন চেষ্টা না করেই বললেন, "এখন তাই হবে অবনীবাবু। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি হাতে আসে না। সময় চাই, ধৈর্য চাই, ত্যাগ চাই—আমাদের দেশের ঐতিহ্যই হচ্ছে ত্যাগ। কষ্ট করে মানুষ জীবন কাটিয়েছে কিন্তু অসুখী হয়নি। তাই আমাদের দেশে দরিদ্রেরা নারায়ণরূপে পূজা পেয়ে এসেছে। ওসব প্রোপাগ্যাণ্ডায় এদেশের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। কমিউনিষ্টরা চায় ভারতবর্ষকে রাশিয়ার ছাঁচে ঢালাই করতে, ক্রেমলিনের আজ্ঞাবাহক এই কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করাই আমাদের জাতীয় কর্তব্য—"

পঁয়তাল্লিশ সনের নির্বাচনে ক্ষিতিশবাবু এই বক্তব্যের ভিত্তিতে চালিয়েছিলেন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার। শুধু প্রচার নয়, সংগঠক হিসাবেও তাঁর দক্ষতা সেদিন সপ্রমানিত হয়েছিল। কমিউনিষ্ট বিদ্বেষে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে তাঁর প্রতিটী পরিকল্পনা

সেদিন হয়েছিল অব্যর্থ—তাঁর এলাকায় কমিউনিষ্টরা হয়েছিল একঘরে, রাস্তায় ঘাটে প্রহৃত আর চরম ঘৃণিত। ছাত্রাবস্থায় বৃটীশ বিদ্বেষ যুবক ক্ষিতিশকে সন্ত্রাসবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি, সেদিনের বাঙলার সাধারণ যুবশক্তির মতই। কিন্তু পেছনে থেকে নিরাপদ অবস্থার মধ্যে বীরত্ব জাহির করার বেশী আর কিছু করার মত ঝুঁকি নেওয়ার অবস্থা ছিল না তার। দুস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ ক্ষিতিশকুমারের আকাশ-ছোঁয়া আকাঙ্খা পথ খুঁজেছিল প্রথমে সন্ত্রাসবাদের পথে, তারপর বিয়াল্লিশ সনোত্তর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কংগ্রেসের মধ্যে। সরকারি গদিতে বসে কংগ্রেসী নেতারা ক্ষিতিশবাবুর কমিউনিষ্টবিরোধী কার্যকলাপের কথা ভুলে যাননি। সাতচল্লিশ সালেই ক্ষিতিশবাবু সোজাসুজি এস্, বি, ইন্সপেক্টর পদে বহাল হন।

ক্ষিতিশবাবুর চোখ দুটো কুঁচকে হিংস্র হয়ে ওঠে, তার ছটা গিয়ে পড়ে অবনীবাবু আর অনাদি দুজনেরই ওপর। অন্তরের গভীরতর আবেগে বিচলিত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠেন, "মনে রাখবেন, আমাদের ভারতবর্ষে আমরা রাশিয়ার মত ধর্মহীন, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন, মায়াদয়াহীন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র কিছুতেই হতে দেব না।"

থতমত খেয়ে যান অবনীবাবু ক্ষিতিশবাবুর কথার ঝাঁঝ দেখে। ক্ষিতিশবাবু হচ্ছেন এস্, বি, ইন্সপেক্টর, তাঁর সামনে এ জাতীয় দুর্বলতা প্রকাশ করাটা যে ভাল কাজ হয়নি, একথা চকিতে মনে হওয়াতে আঁতকে ওঠেন তিনি। তাঁর সার্ভিস্ বুক্-এ আজও রয়েছে লাল দাগ এই এস্, বি'দের কৃপায়। ঘটনাটা তাঁর আজও মনে পড়ে; গিয়েছিলেন তিনি খানাতল্লাসিতে। তাঁর সঙ্গে ছিল এক এস্, বি, ইন্সপেক্টর, তাঁর ইচ্ছে মেয়েদেরও তিনি তল্লাসি করবেন। অবনীবাবুর কাছে এ প্রস্তাব মনে হয়েছিল অমানুষিক! প্রবল আপত্তি এবং পদাধিকার বলে তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন এস্, বি, ইন্সপেক্টরের প্রস্তাব। কিন্তু ব্যাপারটা

শেষ হয়নি সেখানেই। একটা বছর ধরে টানা-হেঁচড়া হয়েছিল তাঁকে নিয়ে, কৈফিয়ৎ আর জবানবন্দি দিতে হয়েছিল ডজন খানেক, শেষ পর্যন্ত হুসিয়ারীর লাল কালির আঁচড় পড়েছিল তাঁর সার্ভিস্ বুক্-এ!

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তুলনা করা, এ ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষিতিশবাবুর কলমের একটা আঁচড়ে তিনি একজন কমিউনিষ্ট না হন কমিউনিষ্ট দরদী যে অনায়াসেই হয়ে যেতে পারেন—এ সম্ভাবনা অবনীবাবুকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কতকটা যেন অনুতপ্ত স্বরে বলে ওঠেন, "তা আর নয়, এমন কি রাশিয়ার ফ্ল্যাগটা পর্যন্ত এদেশে চালাতে চায়! কিন্তু জানেন তো অনাদিবাবু, আপনাদের রাশিয়ায় কোন মানুষেরই নিজের জিনিষ বলে কিছু নেই। তার মানে, আমার স্ত্রী আমার একার স্ত্রী নয়, সকলেরই স্ত্রী—" বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয়ের অতি সরল ব্যাখ্যা করতে পারার খুশীতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। উৎসাহের আতিশয্যে ঘৃণাভরে অনাদির বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলে ওঠেন, "ছিঃ ছিঃ, সতিসাবিত্রীর দেশ এই ভারতবর্ষ, আর সেই সোনার দেশকে কিনা আপনারা বিকিয়ে দিতে চান রাশিয়ার ওই অসুরদের কাছে! আপনারা বিশ্বাসঘাতক—" কথা শেষ করে পা ঠুকে তিনি এগিয়ে যান দরজার দিকে।

ক্ষিতিশবাবু উঠে দাঁড়ালেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অনাদি বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে চেয়ে দেখে ক্ষিতিশবাবু আর অবনীবাবুর মুখের দিকে বারান্তরে, দশচক্রে ভগবানকে কি এরা ভূত বানাতে চায় নাকি! ভেবে পায়না এদের কার কাছে সে বলবে তার নিজের কথাটা। কিন্তু বলতে তাকে হবেই। মরিয়া হয়ে ওঠে অনাদি, প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে। সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিতিশবাবুর মুখোমুখি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি আবার বলছি, আপনারা ভুল করছেন। কস্মিণ কালেও আমি কমিউনিষ্ট নই—"

ক্ষিতিশবাবুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন অনাদির মুখের ওপর গেঁথে বসে। শুধু গালের পেশীগুলো বারেক কুঁচকে গিয়ে তখনই আবার সমান হয়ে যায়। মেঝের ওপর থেকে মলাট ধরে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসখানা আলগোছে তুলে নিয়ে অমায়িক হেসে বললেন, “তাহলে আপনার এই বইখানা আমরা নিয়ে যাচ্ছি—”

মাথার ওপর হেলমেটটা বসিয়ে দিয়ে অবনীবাবু বললেন, “সে তো নিতেই হবে, আর আপনাকেও একটু যেতে হবে অনাদিবাবু আমাদের সঙ্গে—”

তিন

ভোর হয়ে গেছে। ঘরের সামনে চাতালে এসে পড়েছে কম্পমান সূর্যের সোনালি আলো। অন্যদিন এমন সময়ে নির্মলবাবুর বৃদ্ধ পিতা ডাবা হুকো হাতে এসে বসতেন সূর্যের মুখোমুখি। হুকোয় টানও যেমন চলত একটানা, কাশির দমকও তেমনই চলত অনাদ্যন্ত। আর একটু বেলা হলে নাতিরা এসে ছেঁকে ধরে দাদুকে। নাতির আধ-আধ স্বরে কথা একটাও অনাদি বোঝেনা, আবার কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে পড়া দাদুর কথা তার কাছে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু দাদু আর নাতির মধ্যে কথা অনর্গল চলতেই থাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার দুরন্ত একটা ঝোঁক হয় অনাদির। কিন্তু বেরুবার মুখে প্রথমেই নজর পড়ে ছড়ান বইগুলোর ওপর। পাতা খোলা, ওল্টান-পাল্টান, মুচড়ান দুমড়ান বইগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুখ গুঁজে! ব্যথা লাগে অনাদির মনে, এরা যেন ব্যঙ্গ করছে চিনু আর তার প্রেমকে। হ্যাঁ, চিনুকে সে ভাল বাসতে

শিখছে। একদিন সে বোঝা বলে মনে করেছিল চিণুকেই, যখন তার চাকরী ছিল না, ছিল না দুজনের মত মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই। কিন্তু চাকরী সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা আর তার নেই, আয়ও তার স্থিতিশীল, হোক্ না একটু কম! চিণু কলকাতার মেয়ে নয়, গ্রামের মেয়ে। চিণুই বলেছে, 'মনের জোর যদি থাকে, তাহলে গাছতলায় থেকেও সুখী হওয়া যায়।' চিণু যখন একথা বলেছিল তখন অনাদির মনে হয়েছিল, এর চেয়ে বড় সত্য আর দুনিয়াতে নেই! কিন্তু গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে শহরে এসে মনে হয়েছে, চিণুর ওকথা নিছক খানিকটা ভালবাসার উচ্ছাস!

তড়াক্ করে অনাদি এগিয়ে যায় শেল্ফ্‌টার কাছে। এক এক করে বইগুলো তুলে নেয় মেঝের ওপর থেকে, ঝেড়ে মুছে রাখে সেগুলোকে কোলের ওপর। মনে মনে যেন সান্ত্বনা দেয় চিণুকে, এমন রূঢ় ব্যবহার সে আর কোনদিন হতে দেবে না তার ওপর।

ক'খানিই বা আর বই! তুলতে তুলতে ফুরিয়ে যায় এক সময়ে। অনাদির চোখদুটোও স্থির হয়ে যায় লণ্ডভণ্ড ঘরখানার মেঝের ওপর। বারো বছর আগেকার একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের ওপর। অসীমদার বাড়ী তল্লাসি হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত বাড়ীটাকে মনে হয়েছিল আস্তাকুড়! ঘরে যা কিছু ছিল, চাল ডাল, তরিতরকারি, হাঁড়ি কুঁড়ি, বিছানা মাদুর, বাক্স প্যাঁটরা, সমস্ত টেনে এনে উপুড় করেছে বাড়ীর উঠানে, সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে বানিয়ে দিয়েছে একটা ডাষ্টবীন্, জিনিষগুলোর ওপর দিয়ে বুটশুদ্ধ পায়ে মাড়িয়ে বেড়িয়েছে। ঘরের চাল রাইফেলের বেয়ণেট দিয়ে খোঁচা মেরে ফুটো করে দিয়েছে! অনাদির কানে এখনও যেন বাজছে অসীমদার মায়ের সেই চাপা কান্না। সে কান্নার সঠিক অর্থ সে বুঝতে পারেনি তার বারো বছর বয়সে। কিন্তু আজ যেন তার নিজেরই কান্না পাচ্ছে!

ঘরের বাইরে চাতাল থেকে ভেসে আসে প্রচণ্ড এক হাসি। চমকে ওঠে অনাদি, লাফ মেরে উঠে পড়তে যায়। কিন্তু বইগুলো রয়েছে তার কোলের ওপর! সামলে নেয় নিজেকে। হাসিটা যে অবনীবাবুর, একথা মনে হতেই তারও হাসি পায়। ক্ষিতিশবাবুর ধমক খেয়ে কেমন কেঁচোটী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাহলে ওদের মধ্যেও আছে ভয়, ভাবনা! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় অনাদি, লণ্ডভণ্ড ঘরটার ঠিক মধ্যিখানে। সাজান-গোছান ছিম্‌ছাম্ ঘরখানা যেন বারবার ভেসে উঠতে থাকে চোখের ওপর। এই ঘরটার সে মাসিক পনেরো টাকার ভাড়াটে। ঘরটা একটু ছোট! তা হোক্, তবু কলকাতা শহরের বুকে পাকা বাড়ীর একখানা আলাদা ঘর। বড় কম কথা নয়! মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই, জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রথম ধাপ—আর তার সবটুকু কৃতিত্ব তারই।

মেঝের সঙ্গে অনাদির পাদুটো যেন জুড়ে গেছে, এক পা-ও সে এদিকওদিক নড়েনি। হাতদুটো তার অসহায়ভাবে ঝুলছে, পায়ের ওপর ভর্ হয়ে আসছে শিথিল, মাথাটাকে বিরাট এক বোঝার মত ভারি মনে হচ্ছে। বিস্ময় তার প্রতিটী স্নায়ুতে দিচ্ছে ঝাঁকানি! কেন এরা এত নির্মম? একটা মানুষের নিজহাতে গড়ে তোলা সংসারকে কেন এমন করে গুঁড়িয়ে দেয়! অসীমদার মায়ের মতই মনটা তার ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে। মনে পড়ছে এই মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবনের আদ্যোপান্ত। আর তার কান থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দরজার ওপাশে চাতালের ওপর চাপা গলায় কথাবার্তার ফিস্‌ফিস্ শব্দ, থানা ইন্সপেক্টর অবনীবাবুর থেকে থেকে অলস অসমতালে স্ববুট পা ঠোকার আওয়াজ।

এ তো তারই ঘর! হোক্ না অতি ছোট, তবুওতো সে এখনও ভরে তুলতে পারেনি এই ঘরখানাকেই। কেরোসিন কাঠের একটা

তক্তাপোষ সে তো কলকাতায় এসে বাসা বেঁধে নিজের রোজগারের টাকায় কিনেছে। মেঝেয় না শুয়ে তক্তাপোষে শোওয়া, এই শহরের কতজন লোকই বা পারে! নড়বড় করছে! আর তো কটা দিন, বদলাতে তো ওটাকে হবেই—ডবল্-বেড্ একটা তাকে কিনতেই হবে। চিণুতো এইবার আসবে, অপেক্ষা কেবল আর একটু গুছিয়ে নেওয়ার। এখানে এসেও চিণু পড়াশুনা করতে পারবে, ম্যাট্রিকও পারবে দিতে। পাশের বড় ঘরের বাসিন্দা নির্মলবাবুর বড় টাঁক্ এই ঘরটার ওপর। মাঝে মাঝে তিনি উপদেশ দেন, একলা মানুষের মেসে থাকবার কত সুবিধে। আবার আড়ালে রঞ্জণবাবুকে ভয় দেখান, অবিবাহিত একটা যুবকের এমন বাড়ীতে একা থাকার বিপদ সম্বন্ধে। কিন্তু নির্মলবাবুতো জানেন না, তারও টাঁক্ আছে ওই ঘরটার ওপর! ওঘরে শোবে মা, সুজিত আর অজিত, আর এ ঘরটা থাকবে তার আর চিণুর!

লাল পাগড়িধারী এক পুলিশ দরজা দিয়ে অতি সন্তর্পণে মাথাটা গলিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। অনাদির মুখের খুশীর হাসি মুহূর্তে যায় মিলিয়ে। ফ্যাকাশে মুখে ভাবে, ওঃ, তাকেও তো যেতে হবে ওদের সঙ্গে!

শেলফের সামনে ঝপ্ করে বসে পড়ে অনাদি। ঘরটাকে মোটামুটি গুছিয়ে রেখে সে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বে। ফিরে আসতে কত বেলা হবে কে জানে! স্নান সেরে, হোটেলে খেয়ে অফিস যেতে যদি দেরী হয়ে যায়, তাহলেতো আবার ছোট সাহেবের খানিকটা উপদেশ শুনতে হবে। ওঁর ওই এক বাতিক্, ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া চাই-ই। তারপর তুমি কাজ কর, আর গল্প কর, সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপও থাকবে না। বাঙালী জাতকে উনি পাংকচুয়ালিটি শেখাবেনই!

জীবনের চব্বিশটা বছর অনাদির এমনইভাবে তাড়া খেয়ে খেয়েই কাটল। তার বাবা যখন মারা গেলেন তখন তার বয়েস বছর দশেক ৷

কি যে ঘটল আর কি যে হল বুঝবার আগেই একদিন তারা পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গরুর গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী চড়ে দূর কোথাও যাওয়ার উৎসাহ আর আনন্দ সেদিন বারম্বার আঘাত খেয়েছিল মায়ের হাপুস-নয়নে কান্নায়। মামার বাড়ীতে তারা তার আগেও গেছে, তখন মা বলেছেন কত মজার কথা। কিন্তু সেদিনকার মামার বাড়ী যাওয়াটা কেন যে অমন মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল, সে কথা বুঝতে খুব বেশী দেরী হয়নি অনাদির। মামারা ছিলেন মোটামুটি অবস্থাপন্ন কারবারী লোক।

গ্রাম থেকেই অনাদি ম্যাট্রিক পাশ করে প্রাইভেটে। পাশ সে তেমনই করেছিল যেমন পরের বাড়ীতে থেকে অপোগণ্ডেরা করে থাকে। বাড়ীর লোকের সমস্ত ফাই-ফরমাস্ খেটে, তারপর তার পড়ার সময়। তবুও অনাদি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, অবশ্য তৃতীয় ডিভিসনে। তার জন্যে ছিছি দেয়নি কেউই। চিণুর দাদা রেবতীবাবু বরাবর তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, বই জুগিয়েছেন, পড়ায় সাহায্য করেছেন। সহানুভূতি ছিল তাঁর গভীর অনাদির ওপর। অনাদির মামাদেরই জ্ঞাতি রেবতীবাবু আর তাঁর বোন চিণু হয়ে উঠেছিল অনাদির ছিন্নমূল সংসারের একমাত্র শুভানুধ্যায়ী।

পরীক্ষায় পাশ করার পর নতুন এক অবস্থার সৃষ্টি করলেন মা। খুশী হয়ে উঠতে গেলেই তাঁর চোখ দিয়ে জল নেমে আসে দরদর ধারায়। মনের গোপনে কি এক আশায় অধৈর্য হয়ে ওঠেন তিনি। চিণু তাঁকে বারবার বুঝিয়েছে, এইবার অনাদির শহরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত, অবশ্য এটা রেবতীবাবুর মতেরই প্রতিধ্বনি। মা হয়ে ছেলেকে দূর দেশে পাঠাতে বারবার বুক উঠেছে কেঁপে, কি এক অনর্থের আশঙ্কায় মনটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তবুও আশা, ছেলে 'মানুষ' হবে, ছেলের রোজগারে গড়ে উঠবে নতুন সংসার, সে সংসারের তিনিই সর্বেসর্বা!

কিছুদিনের মধ্যে ছোট একটি পুঁটলি নিয়ে অনাদি রওনা হল কলকাতায়। মা তাকে সবার আড়ালে ডেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারিস বাবা, আমাদের নিয়ে যাস। দরকার হলে ঘুঁটে দিয়েও খাব—"

সেদিন আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল যা অনাদির সমস্ত চিন্তার মোড় দিয়েছিল ঘুরিয়ে। চিণু সেদিন তার মামার বাড়ীর সদর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অনাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল চিণুর সামনে এসে, বোধহয় বলতে চেয়েছিল দুটো সান্ত্বনার কথা শক্ত সমর্থ পুরুষালি স্বরে। কিন্তু গলাটা হঠাৎ ধরে উঠল, কথা গেল আটকে। চিণুকে কাছে টেনে এনে চোখের জল মুছে দেওয়ার জন্যে প্রসারিত হাতখানা হয়ে উঠল সঙ্কুচিত। তার বাল্য-সাথি চিণু তখন শাড়ী সেমিজ এঁটে রীতিমত যুবতী! চিণু বললে, "দাদার সঙ্গে দেখা করে যেও—"বলে সে বাড়ী ফেরেনি, গিয়ে বসেছিল অনাদির মায়ের পাশে।

গ্রামের সীমানা পার হয়ে, মেঠো পথ ধরে আলের ওপর দিয়ে চলতে চলতে অনাদি বিস্মিত মনে ভেবেছিল চিণুরই কথা। চিণুর চোখের জল তার তরুণ মনে যেন শান্তিবারি সিঞ্চন করেছিল! একই বেড়ার দু'ধারে চিণু আর তার মামাদের বাড়ী। নিজের ভিটে ছেড়ে এসে মামার সংসারে ওঠার সময়ে চিণু ছিল বছর পাঁচ ছ'য়ের মেয়ে। তারপর মামার বাড়ীর চৌহদ্দি পার হতে আনাদির কেটেছে দশটি বছর। মামাতো ভাইবোনেদের অকালপক্ক বিকৃত ব্যবহারের ফলে চিণুর সহানুভূতিশীল ব্যবহার তাকে করে তুলেছিল চিণুর অন্তরঙ্গ। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিণু হয়ে উঠল মায়ের একমাত্র সুহৃদ, তাদের সুখে দুঃখে একমাত্র আপনার জন। মায়ের ওপর মামা-মামির ব্যবহারে আঘাত যত রূঢ় হয়ে উঠতে থাকে, চিণুর দরদ আর সহানুভূতি

ততই গভীর হয়ে ওঠে অনাদির মায়ের ওপর। ধীরে ধীরে চিণু হয়ে ওঠে তাঁর অন্তরঙ্গ সাথি, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার অংশিদার, তাঁর আশা আকাঙ্খার জাল বোনার মাকু!

ধানক্ষেত পার হয়ে রেল স্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে অনাদি। দূরের ঘন সবুজ পাতলা হয়ে আসছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলোর বিন্দু ঝিকৃমিক্ করছে। বিস্মিত অনাদি দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষণেকের তরে পেছন ফিরে চায় তার ফেলে আসা পথের পানে! মা, সুজিত আর অজিত, আর চিণুও কি! চিণুও কি এদেরই মতন তার অতি নিকট! অতি আপনার! তার ভাবি সংসারের একজন?

কলকাতায় এল অনাদি ভাগ্যের সন্ধানে। আজব শহর কলকাতায় পয়সা নাকি ছড়িয়ে থাকে পথে ঘাটে! কষ্ট করে কেবল সেগুলোকে কুড়িয়ে নিতে হয়! কষ্ট করতে অনাদির কোন ক্লান্তি ছিল না। দূর সম্পর্কে জ্যাঠতুত এক ভায়ের বাসায় এসে উঠল। কিন্তু ঘরপোড়া গরুর মতই পরের বাড়ীকে তার সিঁদুরে মেঘের মতই ভয়। সদাই সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট হয়ে তার দিন কাটে। সবচেয়ে কম খেয়ে, সবচেয়ে কম কথা বলে, সবচেয়ে কম জায়গা নিয়ে সে থাকে।

শশাঙ্কবাবুর চেষ্টায় আর তদ্বিরে অনাদির একটা চাকরী জুটল রেশনিং ডিপার্টমেন্টে। অস্থায়ী সরকারী রেশনিং ব্যবস্থায় সে অস্থায়ী কেরাণী। তবুও অনাদি খুশী! দাঁড়াবার মত একটু স্থান, নিঃশ্বাস নেওয়ার মত একটু অবসর, এইবার সে গড়ে তুলবে তার জীবন ধীরে ধীরে। এইতো তার প্রথম রোজগার, বিস্তৃত জীবন তার পড়ে রয়েছে সামনে। পরিকল্পনার রাশ অনাদির আলগা হয়ে যায়। প্রাণ ঢেলে সে খাটবে, উন্নতী তার ঠেকায় কে! কেরাণী থেকে সাব্-ইন্সপেক্টর, সাব্-ইন্সপেক্টর থেকে ইন্সপেক্টর—এমনি করে ধাপে ধাপে সে এগিয়ে যাবে জীবনে উন্নতীর সিঁড়ি বেয়ে। বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছুটতে থাকে তার কল্পনা—এইবার

নিজের মাথা গুঁজবার মত একটা ঠাঁই, তারপর আনবে মা আর ছুটী ভাইকে, তারপর আসবে চিণু! হ্যাঁ, চিণু বোধহয় তাকে ভালবাসে।

ঘরের সন্ধান অনাদি করতে থাকে—সবচেয়ে কমে যে ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু বিপদ ঘটেছিল তার অন্যত্র যাওয়ার কথা শশাঙ্কবাবুর কাছে উত্থাপন করতে। কিন্তু সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনিই। প্রথম মাসের মাইনে পাওয়ার পর শশাঙ্কবাবু প্রস্তাব করেছিলেন, 'তাহলে অনাদি, এবার তুমি তোমার খাই-খরচ বাবদ নিশ্চয়ই কিছু দিতে পারবে। দেখতেই তো পাচ্ছ, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কেমন ভাবে আছি।' অনাদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কত করে আমায় দিতে হবে?' 'কত আর! গোটা ত্রিশ করে দিও, তার কমে কলকাতায় আজকাল একটা লোকের ছাতু খেয়েও দিন চলে না—' শশাঙ্কবাবু ধার্য করে দিয়েছিলেন মাসহারা।

কিন্তু ঘর জোগাড় করেছিল অনাদি পাঁচ টাকায়, আলোবাতাসহীন একটা খুপ্‌রী। তা হোক, নজির রয়েছে বৃহৎ বৃহৎ ধনিলোকের ফুটপাথে আর পার্কে দিন কাটানর। বাকী, খাওয়া খরচ! তাও অনাদি হিসেব করে দেখেছে হোটেলে খেয়ে মাসে সে পনেরো টাকায় চালিয়ে দিতে পারবে। শশাঙ্কবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করে, ছেলেমেয়েদের হাতে লজেন্স দিয়ে অনাদি তার ছোট পুঁটলিটা নিয়ে উঠে এল তার নিজের বাসায়। মায়ের কাছে সমস্ত কথা খোলাখুলি লিখে পরিশেষে আবেদন করে, 'আর কয়েকটা মাস মুখ বুজে কাটিয়ে দাও মা—আর একটু গুছিয়ে নি।' কিন্তু তার উত্তর আসে, 'আর একটা দিনও যে এখানে থাকতে পারছি না বাবা। আমাদের নিয়ে যা, না হয় আমরাও গতরে খাটব—' চিঠি লিখে দেয় চিণু। একথা জেনেও অনাদির কোন সঙ্কোচ নেই, চিণু তার সমস্ত পরিকল্পনা জানলেও কোন লজ্জা নেই। কেবল সে জানায় না কলকাতা কত কঠিন জায়গা, আর সেই কঠিন

কলকাতায় সে এখন বাস করে গরু-ভেড়ার মত। চিণুর কাছে আলাদা করে মনের দুটো কথা লেখার জন্যে মনটা থেকে থেকে উস্‌খুস্‌ করে ওঠে। কিন্তু সে সাহস অনাদি সঞ্চয় করতে পারে না, ভয় হয়, পাছে তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে মা তাঁর একমাত্র সুহৃদটিকেও হারান। তবু অনাদির চিঠির ভাষা বদলাতে থাকে। সে যেন সব কথাই জানায় দুজনকে—মাকে আর চিণুকেও—মাকে লেখা চিঠিতে সর্বনামগুলো আপনা হতেই বহুবচন হয়ে যায়। চিঠির উত্তর আসে। অনাদির মনে হয়, মায়ের জবানির সঙ্গে চিণুও বুঝি তার নিজের বক্তব্যটা দেয় জুড়ে! শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়া মায়ের আবেদন হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, একটু শান্তির আকাঙ্খা—তার বাইরের কোন কথা মায়ের মনে বুঝিবা আঁচড়ই কাটতে পারে না। চিঠি পেয়ে অভিমান হয় অনাদির। তার এই অমানুষিক কষ্টভোগের কথা কি মা বুঝবেন না! কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির মধ্যে নতুন এক সুর উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করেছে, 'তোমার শরীরের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখবে। সর্বদাই মনে রাখবে, তোমার স্বাস্থ্য ও সামর্থের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।' অনাদির বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে, এই তো আছে সহানুভূতি আর দরদ! বুকটাকে দুহাতে চেপে ধরে অনাদি চোখ বুজোয়। চিণুর কাজলটানা চোখ দুটো যেন টেরিয়ে আছে তার দিকে, দুষ্টামির হাসিতে গালে পড়েছে টোল্—

চাকরীর অষ্টম মাসে অনাদির ওপর জারি হল বরখাস্তের হুকুম—শুধু অনাদি একা নয়, আরও অনেকের ওপর। নোটিশে কোন কারণ দর্শান হয়নি। কানাঘুষোয় সে শুনল, তার সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ। এমন অবস্থায় কি করতে হয় সে জানেনা। রাত্রে অনাদি ঘুমাতে পারে না। কেমন যেন অজানা প্রচণ্ড রাগে তার সমস্ত শরীরটা কাঠ হয়ে ওঠে। মায়ের অশ্রুবিকৃত মুখ বিভৎস দানবের মত হানা

দিতে থাকে তার মুদিত আঁখিপাতার ওপর। বিদায়ের প্রাক্কালে চিণুর সেই কান্নাভরা মুখের সামনে মাথা তার নুয়ে পড়ে। বালিশে মুখ গুঁজে অনাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অফিসের আশেপাশে অনাদিও ঘুরল কয়েকদিন। কিন্তু, যা শুনলে আর যা বুঝলে, তাতে অফিসের পথ মাড়ান সে বন্ধ করলে। ওই একই কথা সকলের মুখে, 'বেআইনী এই বরখাস্তর বিরুদ্ধে আন্দোলন কর'। আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চায় না অনাদি। একবার কোন এক যুগ আগে অসীমদার পাল্লায় পড়ে দুদিন ছেলেমানুষি করার জন্যে চাকরীটাই গেল চলে। এইবার কি কমিউনিষ্টদের পাল্লায় পড়ে জেলে গিয়ে পচে মরবে!

আজন্ম ঝড়-ঝাপটায় মানুষ অনাদি ফিরে আসে আবার নিজের খোলসের মধ্যে। নিজের মধ্যেই নিজে সে ওঠে গর্জে, যেমন গর্জে উঠত মামার বাড়ীতে মামাদের অহেতুক নিষেধের বিরুদ্ধে। বার বার সে গর্জে ওঠে তার সুপরিকল্পিত জীবনের ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে। মানুষ সে হবেই, চাকরী সে জোগাড় করবেই, জীবনের সঙ্গে একাই সে সংগ্রাম করে হবে জয়ী। চাকরী যাওয়ার হেতু আর অযৌক্তিকতা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের মাত্রা দিলে বাড়িয়ে। দল বেঁধে আন্দোলন করে অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সে অবসর সময়ে ঠোঙা বানাতে বসল। সকালে টিউশনি করে, দুপুরে ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘোরে, সন্ধ্যায় আবার টিউশনি করে, খাওয়া সেরে বাসায় ফিরে লম্প জেলে বসে ঠোঙা বানাতে। কলকাতা শহর থেকে সে খুঁটে খুঁটে পয়সা কুড়িয়ে নেবে।

দশ টাকা করে দুটো টিউশনি আগেই ছিল, এর ওপর অনাদি প্রাণপণ চেষ্টা করেও আর একটার বেশী জোগাড় করতে পারেনি। মোট আয় এসে দাঁড়াল আটাশ টাকা—তাও আবার নড়বড়ে।

কখন যে কোন ছাত্র মামার বাড়ী যায় তার নেই ঠিক, আর দশদিন পড়াতে না হলেই এক তৃতীয়াংশ মাইনে যায় কাটা। এক দিনে যত্ত ঠোঙা বানায়, তার খদ্দেরই জোটে না। দাম কমালে খদ্দের জোটে প্রচুর, কিন্তু টাকাও পাওনা থেকে গেছে প্রচুর। শুধু ঠোঙা বানানর রোজগারে নিজের খরচ চালানর সঙ্কল্প আর সে বজায় রাখতে পারেনি। মায়ের হাত খরচ, ভাই দুটীর পড়ার খরচ কমাল, বাসে ট্রামে চড়া বন্ধ করলে, তবুও সঞ্চয়ের যে সামান্য কটি টাকা, তার ওপর হাত পড়ল। জিনিষের দাম আগুন, এক জোড়া কাপড় কিনতে বেরিয়ে গেল একমাসের ঠোঙা বিক্রীর রোজগার। উট্‌কো খরচ যে মাসে হয় সে মাসে অনাদি দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞায় লেগে যায় খাটতে, অর্থাৎ ঠোঙা বানাতে আর হেঁকে বেড়াতে বাড়ী বাড়ী কড়া নেড়ে টিউশনির জন্যে। কাজের বিনিময়ে যদি তার সামান্য অভাবটুকু পূরণ করার কোন ব্যবস্থা থাকত, তাহলে বোধহয় সে গন্ধমাদন পর্বতও মাথায় করে নিয়ে আসতে পারত অন্নদাতার মনস্তুষ্টির জন্যে।

কিন্তু কাজ নেই! কর্মব্যস্ত এই কলকাতা শহরে যেখানে মানুষের মরবার ফুরসৎ নেই, সেখানে অনাদির জন্যে কোন কাজ নেই। তবুও অনাদি ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কাজের চেষ্টায়।

চার

বেকার দশার বছর ঘুরতে না ঘুরতে এল সাতচল্লিশ সালের পনেরোই অগষ্ট!

স্বাধীনতা এল কি এল না, এলে কি হবে, না এলেই বা কি হত, এ নিয়ে মাথা ঘামানর অবসর ছিল না অনাদির। কিন্তু জোর করে

ভাবিয়ে তুললে তাকে তার ছাত্রেরা ছুটী নিয়ে, ঠোঙার খদ্দেররা দোকান বন্ধ করে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মহলে মহলে নতুন খোলস চড়িয়ে। অনাদির সেদিন করবার ছিল না কিছুই। কাজেই সে দাঁড়িয়ে ছিল হাজরার মোড়ে নিতান্ত গেঁয়োর মত। পার্কের মধ্যে চলেছে ব্যাণ্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ, রাস্তা দিয়ে লরিতে লরিতে চলেছে হরেক রকমের লোক নানান ধরণের ধ্বনি করতে করতে। দোকান পাট, বাড়ীর ছাদ-বারান্দা, সর্বত্র তিনরঙা পতাকা। দেশশুদ্ধ মানুষের মুখে খুশীর হাসি, ঝলকে ঝলকে আশার উচ্ছ্বাস!

ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে অনাদি প্রতিটী মানুষের মুখের পানে। একটী ছেলে তার সাথির হাত ধরে হেঁচকা মেরে বললে, 'জানিস্, লাট-প্রাসাদটা এবার হয়ে যাবে শিশুসদন।' বিস্ময়ে অপরজন জিজ্ঞেস করে, 'কেন, আমাদের দেশে কেউ লাটসাহেব হবে না?' প্রশ্নের নির্বুদ্ধিতায় অট্টহাসি হেসে ওঠে বক্তা, 'দূর বোকা, গান্ধিজী বলেছেন স্বাধীন ভারতে পাঁচশো টাকার বেশী কারও মাইনে হবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নিজে পাঁচশো টাকার বেশী এক পয়সাও নেবেন না।'

অনাদি শোনে। প্রতিটী লোকের কথা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। আশা জাগছে, ধীরে ধীরে জাগছে আশা, যে আশার কথা এই একবছরের বেকার দশার মধ্যে সে কারও মুখে শোনেনি। দেখছে, সমস্ত মানুষ যেন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। নবজাতকের মত নতুন চোখ মেলে দেখছে তারা দুনিয়াটাকে। অনর্গল কথা কয়ে চলেছে, যার প্রাণে যত সাধ, যত আশা, সব যেন বেরিয়ে আসছে ফোয়ারার মত।

'এইবার একটা কিছু হবে—' এই কথাটাই অনাদি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রায় প্রতিটী মানুষের মুখে শুনেছে। শুনেছে, খাওয়া পরার আর অভাব থাকবে না, বৃটীশ আর লুঠে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতের সম্পদ সাত সাগরের পারে। দেশের টাকা থাকবে দেশেই,

গড়ে উঠবে হাজারে হাজারে কলকারখানা, কাজের অভাব হবে না দেশের মানুষের, বেকার থাকবে না কেউ—

তাহলে তার চাকরীও সে ফিরে পাবে? এই প্রশ্নটাই অনাদির মনে প্রবল হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই, যে কারণে বৃটীশ আমলে তার চাকরী গিয়েছিল, সেইটাই তো হওয়া উচিত স্বাধীন ভারতে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। পণ্ডিত জওহরলাল, যিনি ছিলেন বৃটীশের চক্ষুশূল, তিনি যদি আজ প্রধানমন্ত্রি হতে পারেন—তাহলে বৃটীশবিরোধী হিসেবে সেই বা চাকরীটা কেন না ফিরে পাবে!

আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে অনাদি। এবার বুঝি সবই পাওয়া যাবে! স্বাধীনতার নজির তো রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া—সেখানে বেকার নেই, অশিক্ষিত নেই, অক্ষম পঙ্গুর জন্যেও সেখানে আছে বাঁচার ব্যবস্থা! তবে! স্বপ্ন নেমে আসে অনাদির চোখে—চাকরী সে ফিরে পাবে, মানুষের মত সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচার মত মাইনে পাবে, কলকাতায় বাসা নেবে, দাসীত্ব থেকে মুক্তি পাবেন মা, সুজিত আর অজিত লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। আর চিণু, যে চিণুকে সে তার মনের মধ্যে থেকে এক মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করতে পারেনি, সেই চিণুকে বিয়ে করার চিন্তা আর তার কাছে বিলাসিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে উঠবে না! অনাদির মনে হয়, সত্যিইতো এসেছে স্বাধীনতা, দেশজোড়া মানুষের মনে লেগেছে জীয়ন কাঠির পরশ—এইবার আসবে মরা গাঙে জোয়ার।

পরদিনই সকালে উঠে অনাদি ছুটে যায় শশাঙ্কবাবুর কাছে। প্রথমেই অনাদির মনে পড়ে তার প্রথম সুহৃদকে যিনি চাকরীতে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন বৃটীশ ছিল, নিশ্চয়ই সাহস করতেন না শশাঙ্কবাবু তার ব্যাপার নিয়ে তদ্বির-তাগাদা করতে। কিন্তু এখন তো আর কোন প্রতিবন্ধক নেই।

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'দেখ অনাদি, মহা দুশ্চিন্তায় আমার দিন কাটছে তোমার জন্যে। তোমার যে এসব ব্যাপার-স্যাপার আছে, তা জানলে আমি কখনও তোমার চাকরীর জন্যে চেষ্টা করতুম না।' এই ধরণেরই কথা শশাঙ্কবাবুর কাছে অনাদি আশা করত বলেই এতদিন আসেনি। 'কিন্তু এখন তো আর কোন ভয় নেই—' অনাদি ঝুঁকে পড়ে শশাঙ্কবাবুর দিকে। বিস্ময়ে কপাল কুঁচকে শশাঙ্কবাবু প্রশ্ন করেন, 'কেন!' বিস্মিত হয় অনাদিও শশাঙ্কবাবুর প্রশ্নে, বললে, "কেন কি! বৃটিশ তো আর নেই। কাজেই ওরা যেগুলোকে অপরাধ মনে করত, সেগুলো তো আজকে আর অপরাধ নয়। আজকে ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, সূর্য সেন নিশ্চয়ই আর কারও শত্রু নয়, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর।' এতক্ষণে যেন শশাঙ্কবাবু বুঝতে পারেন অনাদির বক্তব্য, বললেন, 'ওঃ, তুমি বলছ, আমরা স্বাধীন হয়েছি! বেশ তো, দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। তবে একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, কোন সূত্রে কোথাও তুমি আমার নাম ব্যবহার কর না। তোমার সঙ্গে আমার যে একটা আত্মীয়তা আছে বা সামান্য মৌখিক পরিচয়ও আছে, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তুমি বললেও, আমি সোজা অস্বীকার করব। ছা-পোষা মানুষ আমি, আমার ওপর এতগুলো মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে, আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারব না।' বিস্ময়ে অনাদি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শশাঙ্কবাবুর মুখের দিকে, মুখ দিয়ে তার আর একটা কথাও বার হয় না। তবে কারা কাল পার্কে পার্কে কুচকাওয়াজ করছিল, কারাই বা লরিতে লরিতে স্লোগান হেঁকে যাচ্ছিল, কারাই বা সমস্ত শহরটাকে উৎসবমুখর করে তুলেছিল! বিস্ময়ে, সন্দেহে, আশঙ্কায় অনাদির মনটা চুপসে যেতে থাকে। আবহাওয়াটাকে গরম করে তুললেন বৌদি, শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী, একটা

থালায় কিছু খাবার এনে বসলেন সামনে, 'নাও ঠাকুরপো, একটু মিষ্টি-মুখ করে নাও।' দ্বিরুক্তি করে না অনাদি। মিষ্টিমুখ করানর পেছনে যে উৎসব-আনন্দ লুকিয়ে থাকে, সে আনন্দকে আর যেন সে তেমন ভাবে খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অনাদি। কিন্তু অনর্গল কথা বলে যান বৌদি—লাট-প্রাসাদের গেট কাল সকলের জন্যে খুলে দিয়েছিল, দাঙ্গা থেমে গিয়ে আবার হিন্দু-মুসলমানে ভাব হয়েছে, গত কালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে যান একে একে। শশাঙ্কবাবুও হয়ে পড়েছিলেন অন্যমনস্ক, কিন্তু বৌদি হঠাৎ তাঁকে এক প্রশ্ন করে বসলেন, 'হ্যাঁগো, আমাদের এবার কি হবে?' এ প্রশ্নটায় চমকে ওঠে অনাদি, কিন্তু শশাঙ্কবাবু বদমেজাজে খেঁকিয়ে ওঠেন, 'তোমাদের? তোমরা এবার রাস্তার মোড়ে মোড়ে খ্যাম্‌টা নাচবে।' রাগ করে বৌদি উঠে যান, অনাদিও উঠে পড়ে। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'দেখ অনাদি, একটা কাজ তুমি করতে পার, তোমাদের ইউনিয়নে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা কর। অনেকগুলো কমিউনিষ্ট আছে ওখানে, এমন একটা ব্যাপার পেলে লেগে যাবেখন হৈ হৈ করতে। দেখ, তাতে যদি কিছু হয়।'

অদ্ভুত এক বিস্ময়ের ভাব নিয়ে কেটে যায় অনাদির কয়েকটা দিন। সে তার পুরণো রুটীন ধরেই চলতে থাকে এবং দেখে দুনিয়াটা সেই পুরণো রুটীনের ছকেই বাঁধা আছে। ঠোঙার খদ্দের দোকানদাররা সেই একইভাবে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে ফিকির-ফন্দি আঁটছে, ছাত্রের পিতারা এখনও তাকে শুধু 'মাষ্টার' বলেই ডাকছেন। আর তার দুখের দিনগুলো ক্রমশ যেন আঁটসাঁট হয়ে আসছে!

শশাঙ্কবাবুর মতলবটা এ কয়দিন অনাদিকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। জনকয়েক কমিউনিষ্ট নিছক খানিকটা হৈ চৈ করে যে কিছু করতে পারে, একথা তার বিশ্বাস হয়নি। আবার একথাও মনে

হয়েছে, কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলেও তো কোন গতি হবে না। দোনামনা একটা ভাব নিয়ে অবশেষে অনাদি গিয়ে ওঠে ইউনিয়ন অফিসে। দেখা হয় ইউনিয়নের সেক্রেটারী রসময়বাবুর সঙ্গে। তাঁর সপ্রতিভ, সরল ব্যবহারে অনাদি ঝড়ের বেগে বলে যায় তার সমস্ত কথা। এমন করে, এত আগ্রহ নিয়ে বোধহয় অনাদির জীবনে আর কেউ কোনদিন তাকে কথা বলবার অবকাশ দেয়নি। আবেদনের আকারে বলতে গিয়ে অনাদি তার যৌক্তিকতাও সপ্রমাণিত করার চেষ্টা করে। কথা বলা যখন শেষ হয়েছে তখন অনাদি রীতিমত উত্তেজিত। রসময়বাবু বললেন, 'এমন স্বাধীনতাই দেশজোড়া মানুষ চেয়েছে, এমন স্বাধীনতার জন্যেই ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, এমন স্বাধীনতার জন্যে আর, আই, এন্-এর নৌ সেনারা ধর্মঘট করে অস্ত্র ধরেছিল, এমন স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যেই রসিদ আলি দিবসে কলকাতার মানুষ বৃটীশের বিরুদ্ধে জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিল। কিন্তু সে স্বাধীনতা তো আসেনি অনাদিবাবু! লোকচক্ষের আড়ালে, দেশের মানুষের বুদ্ধির অগোচরে ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা আমাদের জন্যে নয়।' যেন সহজ সরল পথে চলতে গিয়ে প্রচণ্ড এক হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল অনাদি, আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'কেন!' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল পঁয়তাল্লিশ সালের সেই প্রচণ্ড আলোড়ন, এই কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করাই সেদিন ছিল জাতীয় কর্তব্য! চোখ দুটো কুঁচকে ক্রূর দৃষ্টিতে অনাদি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রসময়বাবুর মুখের দিকে। তারপর পুঞ্জিভূত সমস্ত বিরক্তি উজাড় করে দিয়ে বলে ওঠে, 'এইজন্যেই বিয়াল্লিশ সালে আপনাদের দেশদ্রোহী বলেছিল আর পঁয়তাল্লিশ সালে করেছিল ঝাড়ে-মূলে উচ্ছেদ।' রসময়বাবুর মুখের একটা পেশীও কুঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। সেই একই সস্মিতমুখে বলেছিলেন, 'কিন্তু বিয়াল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ

সালের সে অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে আজ সাতচল্লিশ সালে আমরা আরও শক্তিশালী হয়েছি অনাদিবাবু। আপনার এই ঘৃণাকে আমরা বুঝতে পারি, আপনার এই আবেগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর আমরা একথাও মনে করি, আপনার এ অন্ধতা শিগ্‌গীরই কেটে যাবে।' স্তব্ধ হয়ে যায় অনাদি, বিস্ময়ে সে নির্বাক হয়ে থাকে। তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে পনেরোই অগষ্টের সেই উৎসবমুখর দিনটা। রাস্তায় ঘাটে, মাঠে ময়দানে কোন মানুষের মুখে তো এমন কথা শোনেনি, এমন সন্দেহের আভাষও দেখেনি। এরই ফাঁকে মনে পড়ে শশাঙ্কবাবুকে, হ্যাঁ, তাঁকে সে দেখেছে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু বৌদিও তো মনে করেন, তাঁদের একটা কিছু হবে এবার! রসময়বাবু বললেন, 'যাক ওসব কথা, কংগ্রেসী সরকার যখন বলছে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তখন আমরা তাঁদের ঘোষণার ভিত্তিতে স্বাধীন দেশের নাগরিকের মত আমাদের দাবি জানাব। আপনার দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং ইউনিয়ন এ দাবি আদায়ের জন্যে শেষ পর্যন্ত লড়বে।'

ইউনিয়ন থেকে স্মারকলিপি লেখা হল বাঙলার নতুন স্বাধীন সরকারকে বৃটীশ আমলে ছাঁটাই রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে। স্মারকলিপিতে সই দিয়ে বুকভরা আশ্বাস নিয়ে ফিরে এল অনাদি। রসময়বাবু বললেন, 'যখনই সময় পাবেন, আসবেন। অনেক কাজ ইউনিয়নের, আপনাকে পেলে কিছুটা সাহায্য হবে।'

সরকার তরফ থেকে কোন উত্তর আসে না পনেরো দিনের মধ্যেও। অধৈর্য হয়ে পড়তে থাকে অনাদি। সঞ্চয়ের অঙ্ক তার ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আশার নেশায় ঠোঙা বানানর কাজে আসছে ঢিলেমি। ইউনিয়ন অফিসে আসে ঘনঘন রসময়বাবুর কথায় নয় বা ইউনিয়নের কাজে সাহায্য করতেও নয়, আসে নিজের তাগিদে। আর বুঝি অপেক্ষা

করতে পারেনা সে। এ সঞ্চয় ফুরোলে সে করবে কি! আত্মহত্যা! জীবনযুদ্ধে পরাভূত অনাদির মাথায় আত্মহত্যার কথা উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করেছে। ভাগ্য তার ওপর অপ্রসন্ন, একথা সে মেনে নিয়েছে। জীবনের জন্যে সংগ্রাম করতে শেখায়নি তাকে কেউ, আবাল্য দুর্দিনের মধ্যে মানুষ হয়েও অনাদি মায়ের কাছ থেকে. একটী শিক্ষাই পেয়েছে, 'মুখ বুজে সহে যা বাবা, ভগবান একদিন মুখ তুলে চাইবেনই—'

ইউনিয়ন অফিসে অনেক লোকের যাওয়া-আসা, উৎসাহ আর উত্তেজনা, সব কিছুকে এড়িয়ে অনাদি রসময়বাবুর পাশটাতে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। বহু কাজের ঝামেলায় ব্যস্ত রসময়বাবুর দৃষ্টি এড়ায় না অনাদির ওপর থেকে। কাজের ফাঁকে তাকে চা খাওয়ার অনুরোধ করেন, কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন, আবার সে রকম একটা কাজ থাকলে নিঃসঙ্কোচে তাকে কাজটা দিয়ে বসেন। কোন কাজে বাইরে যাওয়ার সময় অনাদিকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে বলেন, 'উত্তরের অপেক্ষায় থাকলে কোন দিনই উত্তর আসবেনা অনাদিবাবু! উত্তর আদায় করতে হবে।'

রসময়বাবুর কথা বিশ্বাস হয়নি অনাদির। কমিউনিষ্টদের কথায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠাটাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ কয়েকটা মানুষ আর পত্রপত্রিকা ছাড়া সর্বত্রই ওই একই সন্দেহ, 'বিদেশীর হাতছানিতে ওরা ওঠে বসে।' তবুও অনাদির মনে হয়, রসময়বাবু লোকটী সত্যিই ভাল! বড় মায়ার শরীর! নির্বান্ধব এই কলকাতা শহরে অনাদি পায় আত্মিয়তার স্পর্শ। ব্যথা অনুভব করে অনাদি, আহা এমন লোকও কিনা কমিউনিষ্টদের পাল্লায় পড়েছে! আরও মনে হয়, শশাঙ্কবাবু তো তার আত্মিয় এবং কমিউনিষ্ট নন, কিন্তু তিনি তো তার জন্যে কোন ঝুঁকি নিতে চান না, এমন কি আত্মিয়তার সম্পর্কটুকুকেও স্বীকার করতে চান না!

দিনের পর দিন পার হয়ে যায়। অবশেষে অনাদি জিজ্ঞেস করে রসময়বাবুকে, 'উপায় কি কিছুই নেই ?'

'আছে বৈকি', আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়েন রসময়বাবু, 'জানেন তো, সোজা আঙুলে ঘী ওঠে না, আঙুলটাকে একটু বেঁকাতেই হয়। আপনাদেরও দাবি আদায় করার জন্যে আন্দোলন করতে হবে।'

ভ্রূ-কুঁচকে অনাদি জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে কি করতে হবে ?'

রসময়বাবু ব্যাখ্যা করে গেলেন আন্দোলনের মূল পরিপ্রেক্ষিত, 'আপনার আন্দোলন কোন একটা ব্যক্তির স্বার্থে কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। আপনার সংগ্রাম আজ গোটা এই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে, যার কর্ণধার হয়ে আছে মুষ্টিমেয় লোভি সর্বগ্রাসি একদল মানুষ—' তারপর ধীরে ধীরে বললেন পর্যায়ের পর পর্যায় কেমন করে গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন, কেমন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে বহু মানুষের মধ্যে, সমাবেশ করতে হবে আন্দোলনের পুরোভাগে সচেতন অংশকে, প্রবল জনমতের চাপে কেমন করে বাধ্য করতে হবে এই সরকারকে তাদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিকে মেনে নিতে।

সব কথা অনাদি বোঝেনি আর বুঝবার চেষ্টাও করেনি। সে শুধু আশ্বাস চেয়েছিল রসময়বাবুর কাছে, জানতে চেয়েছিল পথ, কারণ ভগবানের মুখ তুলে চাওয়ার দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সামর্থ আর তার নেই, সঙ্গতি এসেছে ফুরিয়ে। রসময়বাবুর এইটুকু কথা তার মনে ধরেছে যে, নতুন সরকার নিশ্চয়ই দেশজোড়া মানুষের কাছে হেয় হতে চাইবে না।

উদ্যোগী হয়ে অনাদি আর সমস্ত বরখাস্ত কর্মচারীদের বাড়ীবাড়ী ছুটোছুটি করল, জড় করলে তাদের ইউনিয়ন অফিসে, রসময়বাবুকে সামনে নিয়ে গেল ডেপুটেশনে। এ ব্যাপারেও অনাদির অনন্ত

উৎসাহ, তার কৃচ্ছ্রসাধনের মত নিয়মনিষ্ঠা, ঠোঙা বানানর মতই অদম্য উদ্যম, সঞ্চয়ের জন্যে সব কিছুকে অস্বীকার করার মত মনোবল।

ধাপে ধাপে আন্দোলন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার নেশায় পেয়ে বসে অনাদিকে। বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের যে সংসার ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেছে, ছিন্নমূল হয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে প্রান্তরে, সেই বাস্তহারার জীবনকে আবার স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফিরে যাবে তার পৈতৃক ভিটেয়, তার ন্যায্য অধিকারকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে, তার জন্মভূমির সোনা-মাটীতে সে আবার শিকড় গাড়বে।

একাই অনাদি একশো মানুষ হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত আন্দোলনটাকে সে যেন প্রাণ ঢেলে সাজিয়ে গুছিয়ে তুললে, নিখুঁতভাবে সে কাজ করে যেতে লাগল রসময়বাবুর নির্দেশমত। গোটা তিনেক ডেপুটেশন আর একবার মন্ত্রি ঘেরাও করার পর সরকারী দপ্তর থেকে পুনর্বহালের আদেশ বেরুল।

পাঁচ

তারপর অনাদির এই চাকরী। পূর্বতন পরিকল্পনা মত পাঁচশো টাকার সঞ্চয় এখনও তার সফল হয়নি। বছর এখনও ঘোরেনি তার নতুন চাকরীর পর। তবে আবার তার ওপর এই হামলা কেন? মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে শেল্‌ফে বই গোছাতে গোছাতে কখন অনাদির হাত দুটো গেছে থেমে!

দরজার মধ্যে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এস, বি, ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশবাবু বললেন, "কই অনাদিবাবু, চলুন, আর দেরী কেন, ওগুলো না হয় ফিরে এসে গোছাবেন।"

হাতের বইগুলোকে নামিয়ে রেখে অনাদি উঠে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সেই ভাল, ঝটপট্ ঘুরে এসে কাজগুলো সেরে নেবে। আলনা থেকে জামাটা পাড়তে গিয়ে থমকে যায় সে। ক্ষিতিশবাবু এর আগেও বলেছেন, তাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। লালপাগড়ীওয়ালা পুলিশও মুখ বাড়িয়ে তাকে হুসিয়ার করে দিয়েছে। তবুও কেন যে বার বার তার বিস্মরণ ঘটছে পুলিশের এই অস্তিত্বটাই!

এমনই হয়েছে অনাদির গত বেকার দশার একটী বছর। এই একটী বছর ধরে সে শুধু নিজের কথাই ভেবেছে, আর এমন তন্ময় হয়ে ভেবেছে যে তুনিয়ার কোন কিছুই তার মনের মধ্যে সেঁদোতে পারেনি। ভেবেছে শুধু, কেমন করে আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকা যায়। সুস্থ সবল একটা মানুষ, বয়সে যুবক, সে ভেবেছে আদিম মানুষের মত শুধু নিজের দিন গুজরাণের কথা—কি খাবে, কোথায় থাকবে! আর মনে হয়েছে, মা আর তুটী ভাইয়ের জন্যে কেনইবা সে প্রাণপাত করতে যাবে! স্বর্গত পিতার ওপর প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় উঠেছে ফুঁসে, কেন তিনি বিবাহ করেছিলেন, কেনই বা তিনি এতগুলি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যদি না তিনি তাদের জন্যে কোন সংস্থান করতে পারেন! কেনই বা সে পিতার অবিমৃষ্যকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবে! আর চিণু! ভালবাসা, প্রেম ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে অনাদি, ওসব বড়-লোকের জন্যে, বাড়ী গাড়ী যাদের আছে মেয়ে নিয়ে ন্যাকামি, ঢলাঢলি তাদেরই সাজে! জীবনটা অনাদির হয়ে উঠেছিল তার চিন্তাধারার অনুপাতে রূঢ়, রুক্ষ, অকরুণ। তাই বন্ধু বলে সে কাকেও কাছে ডাকেনি, কারও কাছে এগিয়ে যায়নি! বন্ধুত্ব করলেই সৃষ্টি হবে সামাজিকতা, আর তার ফলে একজনের কাছে একদিন চা খাওয়ার প্রতিদানে তাকেও কোন না তু'আনা পয়সা খরচ করতে হবে আর একদিন!

কিন্তু কেমন যেন ঘুলিয়ে দিলেন তার জীবনটাকে রসময়বাবু। নিজের পকেটের শেষ কপর্দক তিনআনা বার করে দিয়ে অনাদিকে বললেন বাকী একআনা দিতে, তাহলেই দুজনের দু'কাপ চা হয়ে যাবে। রসময়বাবুর এই অতি সহজ ব্যবহারটা অনাদিকে কেন যে গোড়া ধরে নেড়ে দিলে, সে কথা অনাদি বুঝতে পারেনি। কিন্তু কেন যেন রসময়বাবুকে তার বড় আপন বলে মনে হয়েছিল।

সজাগ হয়ে ওঠে অনাদি। আর সে এখন রসময়বাবুর কথা ভাববে না। ভাবতে বসলেই দেরী হয়ে যাবে, আর অফিস যেতে দেরী হলেই ছোট সাহেবের খিঁচুনি—অসহ্য! জামাটাকে পেড়ে নিয়ে হাত গলাতে গলাতে মনে হয়, কিন্তু···

কিন্তু দিয়ে যে ভাবনাটা সুরু হয়, অনাদির কাছে সেটা অভূতপূর্ব। কেনই বা সে যাবে? পুলিশ কি এমন গণ্যমান্য ভদ্রলোক যে শুধু তাদের মুখের কথায় সে যাবে তাদের পেছন পেছন সুড়সুড় করে! কই কেষ্টবাবু তো ওদের কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে ভালমানুষটির মত সোজা ওদের পেছন পেছন যান নি! গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে, বললেন, 'ধরে নিয়ে যেতে যখন এসেছেন, তখন ধরেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনাদের হুকুমের দাস আমি নই। আপনাদের জোর হচ্ছে পুলিশ, লাঠি, গুলি—তারই জোরে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, তা আমি জানি—কিন্তু আপনাদের মুখের কথায় নয়।' সে কি এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি! বেচারা ইন্সপেক্টর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েছে কেষ্টবাবুর দিকে, অন্য পুলিশগুলো হুকুমের অপেক্ষায় আছে উদাসীন হয়ে। কেষ্টবাবু হাসছেন মুচকে মুচকে। পুলিশ ইন্সপেক্টর মুখখানা লাল করে, চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলেন, 'তাহলে আপনি যাবেন না?' কেষ্টবাবু শান্তভাবেই বললেন, 'আমার তো যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।' হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে ইন্সপেক্টর চলে গেলেন ছোট সাহেবের

ঘরে। ডিপার্টমেণ্ট শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে কেষ্টবাবুর চেয়ারটার পেছনে। এলেন ছোটসাহেব মহাবিরক্ত হয়ে, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কেষ্টবাবুর ওপর, 'অফিসের মধ্যে কোন ঝামেলা করবেন না কেষ্টবাবু, পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথা শুনতে আপনি আইনত বাধ্য—'হন্‌হন্ করে তিনি চলে গেলেন তাঁর কামরার মধ্যে। পুলিশ ইন্সপেক্টর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'কই উঠছেন না যে!' কেষ্টবাবু ব্যঙ্গ করে ওঠেন, 'আমি যে আপনাদের খাতিরের লোক—আপনাদেরই তো আমাকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা—' মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায় কেষ্টবাবুর চপলতা, 'খুব তো এসে হাঁক ডাক করছেন, যেন মস্ত অপরাধি আমি; কিন্তু বলুনতো খোলাখুলি আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা কি?' বিস্মিত হয়ে পড়েন পুলিশ ইন্সপেক্টর, এমন অবাস্তর প্রশ্ন যেন তিনি কখনও শোনেনি, চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অভিযোগ আবার কি! সিকিউরিটি এ্যাক্টে আপনাকে ধরা হচ্ছে।' কে যেন কেষ্টবাবুর পেছনে ভীড়ের মধ্যে থেকে বলে ওঠে, 'সিকিউরিটি এ্যাক্টে ধরার জন্যে কোন অভিযোগ দরকার হয় না? আশ্চর্য!' এতক্ষণ একটা কথাও কেউ বলেনি, নড়েনি-চড়েনি একটুও। এইবার যেন সকলের হুঁস্ হল, সিকিউরিটি এ্যাক্ট নামে এমন একটা আইন আছে, যাতে পুলিশ এসে কোন অভিযোগ না দেখিয়েও একটা মানুষকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, মাসের পর মাস জেলে আটকে রাখতে পারে!

ঘটনাটা ঘটেছিল মাত্র কয়েকদিন আগে। অনাদির সেদিন মনে হয়েছিল, এমন আইন কানুন তো ছিল বৃটীশ আমলে! সেই আইনের বলে বৃটীশ সরকার বাঙলাকে শ্মশান করে দিয়েছিল। অসীমদাকে যেবার ধরে নিয়ে গেল, তার এক মাসের মধ্যে গ্রামটাকে উজাড় করে দিয়েছিল, যুবক বোধহয় একজনকেও বাদ দেয়নি! গ্রাম জুড়ে সে কি কান্নার রোল্ পড়েছিল! এত কথা মনে হওয়া সত্বেও

কেষ্টবাবুর ব্যাপারে অনাদি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবারই চেষ্টা করেছিল। একবার খোয়ান চাকরী পূনর্বার ফিরে পেয়ে, চাকরীর ওপর তার বড় মায়া, নিজে যেচে এগিয়ে যাওয়ার মত বোকামী আর সে কোনদিন করবে না। রাজনীতির ধারে কাছে সে কখনও যাবেনা, যে প্রতিজ্ঞা সে মামার বাড়ীতে মায়ের পা ছুঁয়ে করেছিল তার অজ্ঞান কিশোর বয়সে—সেদিন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, জীবনে বহু ঝড়ঝাপ্‌টা খাওয়া পরিণত বয়সে সেই প্রতিজ্ঞাই আবার ঝালিয়ে নিয়েছিল নিজের কাছে।

যখন সত্যিসত্যিই কেষ্টবাবুকে পুলিশের দল টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অনাদি টেবলের ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে প্রবল এক ব্যথাকে প্রাণপণে চাপছিল। কেষ্টবাবু কমিউনিষ্ট, রসময়বাবুদেরই একজন, তাঁকে অন্যায়ভাবে তার চোখের ওপর দিয়ে জোর করে নিয়ে গেল, আর সে কিছুই করতে পারল না! রসময়বাবুর কাছে মনে মনে অনাদি ক্ষমা চেয়েছিল, 'বড় অক্ষম আমি রসময়বাবু, কোন মানুষেরই কোন কাজে লাগলাম না আমার জীবনে।' অনাদির পাশের টেবলের বিরজা, ঝড়ের মত এসে ঝট্ করে চেয়ারটা টেনে নিয়ে সশব্দে বসে পড়ে আপন মনে গর্জে উঠল, 'শালারা যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে!'

আজ এই মুহূর্তে যখন সেই পুলিশের দল তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, তখন অনাদি হঠাৎ বিরজার কথাটাই বলে উঠল দাঁতে দাঁত চেপে, "শালারা যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে—" কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বাড়ীশুদ্ধ লোকের কথা। অফিসশুদ্ধ লোক যদি কেষ্টবাবুকে ঘিরে দাঁড়াতে পারে ওই পুলিশের সামনে, তাহলে এ বাড়ীর বাসিন্দা প্রায় পঁচিশটা লোক গেল কোথায়! ঘুম কি তাদের কারও ভাঙেনি! ওই প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দ, পুলিশী বুটের খট্‌খট্ আওয়াজ, অবনীবাবুর ওই বাজখাঁই হাসি, কোন কিছুই কি কারও

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি! গভীর শ্লেষে ঠোঁট দুটো কুঁচকে ওঠে অনাদির, "জেগে ঘুমোলে কি আর কারও ঘুম ভাঙে!"

মুহূর্তের মধ্যে হতাশা অনাদিকে পেয়ে বসে। এত বড় এই বিশাল দুনিয়ায় সে একা! কিন্তু তখনই মনে পড়ে, নাঃ, রঞ্জণবাবুতো উঠেছিলেন, আর তিনি তো মেজাজ দেখিয়ে এই পুলিশদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। পুলিশেরা তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু তিনি কোন সাহায্য করেন নি এদের। হ্যাঁ, তারাও কেউই কেষ্টবাবুর বেলায় পুলিশকে কোন সাহায্য করেনি। কিন্তু নির্মলবাবুও তো আছেন পাশের ঘরে! পেছনের দিকে আছেন সোমেনবাবু আর ওপরে আছেন বাড়ীওয়ালা শ্রীমন্তবাবু। এতগুলো মানুষ, যদি সামনে এসে দাঁড়াতেন, তাহলে সে-ও কেষ্টবাবুর মত শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারত।

সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েও অনাদি কান খাড়া করে আছে। এতক্ষণে তার মনে হচ্ছে, বাড়ীটা যেন থম্‌থম্ করছে, সমস্ত বাড়ীটার বুকে চেপে বসেছে এক জগদ্দল পাথর। তারই দুঃসহ ভারে সমস্ত বাড়ীটা যেন মূক হয়ে গেছে। মনে পড়ে যায় অন্যদিনের কথা। ঘরে ঘরে ভাড়াটে বসান বাড়ীটার বিচিত্র সকালবেলা। এতক্ষণ কলতলা আর পায়খানায় পড়ে যেত সোরগোল। রঞ্জণবাবুর সময় একটু বেশী লাগে, তা নিয়ে নির্মলবাবুর বাক্যবাণ ছুটতেই থাকে যতক্ষণ না রঞ্জণবাবু বেরিয়ে আসেন। আর নির্মলবাবুর যত ঝাল তার ওপর। আইবুড় ছেলের কলতলার ধারেকাছে যাওয়াটাই তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। মেয়েরা কেউ কলতলায় থাকলে, বিশেষ করে রঞ্জণবাবুর স্ত্রী হলে তো কথাই নেই—খোলাখুলি ইঙ্গিত করে বসেন নির্মলবাবু তাকে। শান্তশিষ্ট বৌটী বিরক্ত হয়ে কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে যান। নির্মলবাবু কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ওই কলতলারই সামনে একটা টুথ্-ব্রাশ হাতে নিয়ে।

তারপর বাচ্চাদের উপদ্রব! নির্মলবাবুর তিনটী আর রঞ্জণবাবুর একটী। নির্মলবাবুর ছেলে তিনটীর যত উপদ্রব অনাদির ঘরে, বাইরে চাতালে তারা কিছুতেই খেলবে না। রঞ্জণবাবুর মেয়েটী কিন্তু একা একা খেলা করে ওই চাতালে, অনাদির ঘরে সে কিছুতেই ঢুকবে না। নির্মলবাবুর তিনটীকে সামলাতে অনাদি হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়। তিনটীতে মিলে একবার যদি ঘরে ঢোকে দু'মিনিটের জন্যে তাহলে তারই মধ্যে হামাগুড়িওয়ালাটী করবে প্রস্রাব, সদা উলঙ্গ মধ্যমটী পলকের মধ্যে বিছানার চাদরে নাক মুছে দেবে, আর দলের নেতা বড়টী ততক্ষণে শেল্‌ফ্ থেকে কয়েকখানা বই এক হেঁচকায় পেড়ে ফেলবে মেঝের ওপর! আজ যেন অনাদির ওদের জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি করে উঠছে। ওরাও কি এখনও জাগেনি!

নাঃ, ওই তো শব্দ আসছে! ঠিক যেন গোঙানির মত! চাপা গলায় নির্মলবাবু কি যেন বলছেন আর তাঁর খর্‌খরে স্ত্রী বিরক্তিতে থুঃ করে একটা শব্দ করলেন। দাঁতের ফাঁক দিয়ে স্‌স্ শব্দ করে কে যেন কাকে কি নিষেধ করছে। অনাদি যেন দেখতে পায় নির্মলবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি ধড়মড় করে উঠে পড়ছিল বিছানা থেকে। ঘুম যখন ভেঙেছে তখন কেনই বা আর শুয়ে থাকবে! এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ডতো তাদের জীবনে আর কখনও ঘটেনি! সারা বাড়ীটা জুড়ে তাদের কত কাজ!

কান পেতেই থাকে অনাদি। ভাল লাগছে তার সারা বাড়ীটা জুড়ে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে অনুভব করতে। তাহলে তার বিনিময়ে মজা উপভোগ করছে না কেউই! কিন্তু ওদেরই বা এত ভয় কেন? পুলিশ কি এমনই একটা জিনিষ যা সহজ স্বাভাবিক জীবনকে তচ্‌নচ্ করে দিতে পারে!

আলনা থেকে এক ঝট্‌কায় টেনে নেয় হাফ্-সার্টটা, হাতার মধ্যে

গলিয়ে দেয় হাত দুটো। জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে অনাদি দরজার বাইরে।

ক্ষিতিশবাবু যেন ওৎ পেতে ছিলেন। হেসে বললেন, "তাহলে হল আপনার!"

সে কথায় কর্ণপাত না করে অনাদি প্রশ্ন করে, "কোথায় যেতে হবে?"

অবনীবাবু আর ক্ষিতিশবাবু একই সঙ্গে উত্তর দিতে থাকেন, "এই কাছেই—" এস্, বি, ইন্সপেক্টর কথা বললে তখন আর থানা ইন্সপেক্টরের কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না, বোধহয় সেই কারণেই অবনীবাবু টপ্ করে গিলে নেন বাকী কথাগুলো। ক্ষিতিশবাবু বলে যান, "মানে থানায়। বড় জোর আধ ঘণ্টার জন্যে—"

সোজাসুজি অনাদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, "কেন?"

অমায়িকভাবে ক্ষিতিশবাবু উত্তর দেন, "এই আর কি, আপনার একটা স্টেটমেণ্ট নিতে হবে কিনা—তাই—"

"সে রকম কোনো ওয়ারাণ্ট তো আপনারা আনেন নি!"

আইন ও শৃঙ্খলার যাঁরা রক্ষক তাঁদের মুখের ওপর অনাদির এমন প্রশ্ন সহজেই বিচলিত করে তোলে অবনীবাবুকে। থানা ইন্সপেক্টর তিনি, চোর-ছ্যাচোর নিয়ে তাঁর কারবার। একমাত্র পদাধিকার বলে যাঁরা তাঁর উচ্চপদস্থ তাঁদের ছাড়া আর সকলকেই তিনি আসামী বলে মনে করেন। তাঁর সামনে অনাদির মত ফুচকে ছোঁড়া কিনা এমন চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি কপচায়! মুখখানা তাঁর হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে। ডান পায়ের গোড়ালিটা জোর দিয়ে ঠুকে ঈষৎ একটুখানি এগিয়ে আসেন। কিন্তু সঙ্গে রয়েছেন এস্, বি, ইন্সপেক্টর। ক্ষিতিশবাবু বাঁ হাতটা তুলে অবনীবাবুর পিঠের ওপর রেখে অনাদিকে বললেন, "আপনার প্রশ্ন সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন,

ওরকম একটা অর্ডার আমিই দিতে পারি। তবে কিনা আপনাকে এ্যারেষ্ট করা বা অযথা হয়রাণ করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল একটা স্টেটমেণ্ট পেলেই আপনার সঙ্গে আমাদের কাজ শেষ—” এইটাই যে তাঁর শেষ কথা, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে একধাপ তিনি এগিয়ে যান চাতাল থেকে নামবার সিঁড়িটার দিকে।

ক্ষিতিশবাবু আর অনাদির মাঝখানে এই ব্যবধানটা কাজে লাগালেন অবনীবাবু, রীতিমত তেড়েফুঁড়ে এসে এক দমে বলে গেলেন, “আর ওই যে বললেন ওয়ারাণ্ট আনিনি, ও হুকুম আমিই দিতে পারি। জানেন, সিকিউরিটী এ্যাক্টে সে ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে—”

এক পলকের মধ্যে অনাদির মনে পড়ে যায় বিরজার রুদ্ধ আক্রোশে হিস্‌হিসিয়ে ওঠা কণ্ঠস্বর, ‘শালারা যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে!’ বুকের মধ্যেটা তার তোলপাড় করে ওঠে কথাটা চিৎকার করে বলে ওঠার জন্যে। কিন্তু চোখ দুটো অনাদির স্থির হয়ে যায় অবনীবাবুর শক্তিমত্ত মুখখানার ওপর। অসীমদার বৃদ্ধ বাবার পেটে বুটশুদ্ধ লাথি মারার দৃশ্যটা যদিও সে স্বচক্ষে দেখেনি, তবুও, অবনীবাবুর দাম্ভিক মুখখানার মধ্যে পিটপিটে চাহনি দেখে তার মনে হল, বোধহয় এই ভদ্রলোকটিই সেই মহৎ কাজটী করেছিলেন!

ঝপ্ করে অনাদি একেবারে ঘুরে দাঁড়ায়। কেমন যেন দুরন্ত একটা রাগ গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে তার মাথার মধ্যে, হয়তো কেষ্টবাবুর চেয়েও বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। হন্‌হন্ করে ঢুকে যায় অনাদি ঘরের মধ্যে। কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে শেলফের ওপর থেকে তালা-চাবিটা বার করে নিয়ে আসে। দড়াম্ করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। কড়া দুটো ধরে ক্ষণেকের তরে থাকে থমকে। মুহূর্তে মনটা মুচড়ে দুমড়ে যায়, চোখ দুটো যেন জ্বালা করে ওঠে। ওঃ, এ দুনিয়ায় সে কি সাংঘাতিক অসহায়!

টেপা-তালাটা টিপে দিয়ে অনাদি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়। চোখ দুটো যেন তার আটকে যায় সামনের ঘরের বাসিন্দা রঞ্জণবাবুর দরজায়। ও ঘরের শান্তশিষ্ট সেই বৌটী দরজার একটা পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মুহূর্তের মধ্যে ক্রূরতায় অনাদির মনটা ঝলসে ওঠে, এতক্ষণে মজা দেখবার জন্যে মুখ বার করেছেন! কিন্তু চোখ তুলে বৌটীর মুখের পানে চেয়ে থমকে যায় অনাদি। সোজা, তীক্ষ্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন চৌকাঠের দু'পারে দুটো পা রেখে, ফ্যাকাশে ফর্সা মুখখানায় যেন শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে, কি এক অস্বস্তিতে চৌকাঠের বাইরে পায়ের আঙুলগুলো নিস্‌পিস্‌ করছে। অন্যদিন যখনই অনাদি মহিলাকে দেখেছে, তখনই সে কেমন যেন এক ব্যথা অনুভব করেছে। মনে হয়েছে, এত শান্ত, এত শিষ্ট একটা জীবন্ত মানুষ হয় কি করে! পৃথিবীর বুকে এই যে মানুষটা মুখ বুজে জীবন কাটিয়ে চলেছে, না-জানি তার বুকের মধ্যে কত কথাই জমা হয়ে আছে! অনাদির মনে অদ্ভুত এক সন্দেহ দেখা দিয়েছে—চিণু যখন তার পরিণীতা স্ত্রী হয়ে তার সংসারে আসবে, তখন সে-ও কি অমনই মূক হয়ে যাবে! শিউরে উঠে সে মায়ের কথা ভাবে। তার মা-ও মুখ বুজে থাকেন, মুখ বুজে থাকতেন তাঁর স্বামীর সংসারে, আর আজ ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে সেই মুখ বুজেই আছেন। কেবল আঘাত যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন কেবল দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখের কোল ছাপিয়ে।

অনাদির মনে হল, শান্তশিষ্ট বৌটী যেন তাকে কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু, বাড়ীতে এত লোক থাকতে কেবল উনি কেন! রঞ্জণবাবুর গলার স্বরতো সে গোড়ায়ই শুনেছিল—তিনিই বা গেলেন কোথায়! কেবল কি শান্তশিষ্ট এই বৌটীরই মনে পড়ল, এ বাড়ীর একটা লোক বিপদে পড়েছে!

হঠাৎ অনাদি অস্বাভাবিক চমকে ওঠে স্টোভ্ জ্বলে ওঠার আওয়াজে! সোজা মুখ তুলে সে চেয়ে থাকে শান্তশিষ্ট বৌটীর মুখের পানে। এতক্ষণে অনাদির মনে ভাল লাগার ভাব ঘনিয়ে উঠছে। জগদ্দল পাথরের চাপে মূক বাড়ীটার বুকে জাগছে স্পন্দন, গলা টিপে ধরা বাড়ীটার বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর। এইবার কলরবে ফেটে পড়বে সমস্ত বাড়ীটা। বাড়ীশুদ্ধ মানুষ, যে যার নিজের কাজে বেরিয়ে আসবে ঘেরাও-করা বাড়ীর পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্যে থেকে। দরজা থেকে সরে গিয়ে অনাদি ক্ষিতিশবাবুকে বললে, "চলুন—"

সঙ্গে সঙ্গে শান্তশিষ্ট বৌটীর কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, "অনাদিবাবু, আর একটু দাঁড়ান—"

থতমত খেয়ে যান ক্ষিতিশবাবু, অবনীবাবুর মুখখানা কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে ওঠে। অসহায়ভাবে হাত ছড়িয়ে, কাঁধ কুঁচকে, মাথার টুপিটা খুলে হাওয়া খেতে থাকেন অবনীবাবু। অনাদিরও নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লেগে যায়। এ বাড়ীতে সে এসেছে আজ তিনমাস। কোনদিন তো সে কথা বলেনি এই বৌটীর সঙ্গে, সে ফুরসৎ তার ছিল না। কিন্তু আজ তার এমন দুঃসময়ে তাকে ওঁর কি প্রয়োজন পড়ল! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে আমতা আমতা করে বললে অনাদি, "আমায়—আমায় কিছু বলছেন?"

শান্তশিষ্ট বৌটী বললেন, "আর একটু বসে যান—আপনার জন্যে চায়ের জল চড়িয়েছি।"

সহজ, সাধারণ ওই কথা কয়টা অনাদি কান পেতে শোনে। সমস্ত শরীরটা তার থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে। আর ঝপ্ করে খানিকটা জল কেন যে চোখের কোল উপচে গালের ওপর এসে পড়ে, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারেনা।

ছয়

চাতাল থেকে নেমে খানিকটা খোলা জমি, তারপর কাঠের ছোট্ট গেট। সোজা গেট পর্যন্ত গিয়ে তার একটা পাল্লা ধরে ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়ায় অনাদি। এবার দেশ থেকে ফেরার সময় চিণুকে সে কাঁদতে দেখেনি, কিন্তু কতই না করুণ হয়ে উঠেছিল চিণুর মুখখানা! মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনাদির। কেবলই মনে হয়েছিল, কত কথাই যে চিণুকে বলা হয়নি।

চকিতের মধ্যে অনাদি বাড়ীটার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। সত্যিই তার বাড়ীটাকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে। এ বাড়ীতে সে এসেছিল মাস তিনেক আগে—তখনই সে এসেছিল যখন সে নিজেকে স্থিতিশীল মনে করেছিল আর চাকরীটা সম্বন্ধে ছিলনা কোন উদ্বেগ। এইখানে আসার পরই চিণুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে।

তাই নিয়ে কি কম ঝঞ্ঝাট! চিণুর দাদা রেবতীবাবু যে এ ব্যাপারে এমন বেঁকে দাঁড়াবেন, একথা চিণুও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। অনাদির ওপর রেবতীবাবুর স্নেহ আর সহানুভূতি অপরিসীম, আর সে স্নেহ আজও তেমনই অবিকৃত আছে। কিন্তু চিণুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আপত্তির কারণ, 'বাবার অবর্তমানে বোনটাকে তা বলে জলে ফেলে দিতে পারিনা।' চিণুতো ক্ষেপে লাল, 'অমন জলজ্যান্ত মানুষটাকে কিনা জল বানিয়ে দিলে! বলি, বিয়েটা হবে একটা মানুষের সঙ্গে না আয়রণ চেষ্টের সঙ্গে!' ভাইবোনের অমন সুন্দর সম্পর্কে কেমন যেন ছেদ পড়েছে—রেবতীবাবু কর্তব্যনিষ্ঠায় অটল আর চিণু দুর্জয় অভিমানে পাগল। অনাদি বুঝিয়েছে চিণুকে, 'দাদা ঠিকই বলেছেন, আমার মত লোকের বিয়ে করা সাজে না।' চিণু কোন কথা মানে না, 'বিয়ে তো তুমি একা করবে না, বিয়ে করার

দায়ীত্ব আমারও আছে।' তারপর থেকে চিণু লেখাপড়া সুরু করেছে নতুন উদ্যমে। তার পরিকল্পনা, আগামী বছর দেবে ম্যাট্রিক, তারপর চাকরী করবে সে, তাহলে তো আর জলে পড়া হবেনা।

অবাক হয়ে যায় অনাদি তার নিজের ভাবনায়। তার চাকরী আর চিণুর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারটা এমনভাবে জড়িয়ে থাকে কেন! এই এখনই সে ভাবছিল, 'নাঃ চিণুর দাদা ঠিকই বলেছেন।' বাড়ীটার ছাদ থেকে উঠানের জমি পর্যন্ত এক নজরে একবার দেখে নেয় অনাদি। নিজেই নিজেকে বোঝালে, কেবল অশুভ চিন্তাই বা সে করছে কেন! আবার তো ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে আসছে, তারপর যাবে অফিসে, তবে খাওয়াটা বোধহয় এবেলা আর হয়ে উঠবে না।

ক্ষিতিশবাবু আছেন অনাদির ঠিক পেছনে অনেকটা ছায়ার মত। অনাদি জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে স্টেট্‌মেণ্ট লিখতে?"

"কত আর, বড় জোর আধঘণ্টা, আর যেতে আসতে যা সময়—" ক্ষিতিশবাবুর রেডিমেড্ উত্তর।

চোখ কুঁচকে অনাদি চেয়ে থাকে ক্ষিতিশবাবুর দিকে। সন্দেহ জাগে, বড্ড সহজভাবে যেন কথা বলছেন। কিন্তু এত সোজা মানুষ তো এঁরা নন। অবনীবাবু ওদিকে হাঁকডাক করে সমস্ত সিপাইশান্ত্রী জড় করছেন। রাস্তায় বেশ বড়গোছের একটা ভীড় জমে উঠেছে।

শেষবারের মত বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে নেয় অনাদি। বাড়ীওয়ালা শ্রীমন্তবাবু যেন আণ্ডারওয়্যার আর সামারকুল্ গেঞ্জি পরে জানলা থেকে সুট্ করে সরে গেলেন! কেমন যেন হাসি পায় অনাদির। এরই মধ্যে সে একটা ভয়াবহ জীব হয়ে উঠেছে! ফিরে এলে হয়তো কেউ তার ধারেকাছেও ঘেঁষবে না! দোতলা থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে একতলার চাতালে রাখে। শান্তশিষ্ট বৌটী এবার দরজাটা ধরে একেবারে চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মেয়েটী কোলে

ওঠার জন্যে দু'হাত মেলে কাপড় ধরে টানাটানি করছে। আর তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনাদির দিকে।

বিনীতভাবে ক্ষিতিশবাবু বললেন, "তাহলে চলুন অনাদিবাবু, রওনা হয়ে পড়া যাক্। আবার তো আপনাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

চমক ভাঙে অনাদির। চোখে পড়ে ক্ষিতিশবাবুর মুখখানা আর তাঁর ঠোঁটের কোণে অতি মৃদু একটুখানি হাসি আর জলজ্বলে চাহনি। আঁতকে ওঠে অনাদি, বোধহয় ও ব্যাটা শান্তশিষ্ট বৌটীর এই ব্যবহারের একটা মুখরোচক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে! ঘৃণায় মন রী রী করে ওঠে অনাদির, যেমন কাজ করে ব্যাটারা, তেমনি কি ওদের মনগুলোও নোংরা! ঝপ্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটতে সুরু করে দেয়। গেট পার হয়ে যেই বাইরে এসে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন রাইফেলধারী পুলিশ এসে তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর বাকী সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়ায় একটু তফাতে তফাতে। রাস্তার ওপারে ভীড়টাও যেন একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায়, অনেকগুলো কথার গুঞ্জন ভন্‌ভন্ করে ওঠে। মুখ তুলে অনাদি চাইতে পারছে না ভীড়টার দিকে। অপরিসীম এক লজ্জা আর সঙ্কোচে তার মাথা নিচু হয়ে যায়। হয়তো ওরা তাকে মনে করছে দাগী একটা আসামী।

একরাশ বিস্ময় এক ঝলকে অনাদির মন আচ্ছন্ন করে ফেলে। এরাই বা এত পাঁয়তারা কষছে কেন তাকে নিয়ে! সে তো না টেররিষ্ট, না কমিউনিষ্ট! সে এক নিরিহ গরীব মানুষ, পেটের দায়ে ছিটকে আসা গ্রামের একটী ছেলে! এ দুনিয়ার কোন সাতে-পাঁচে সে থাকতে চায়নি, শুধু চেয়েছে মানুষের মত একটু বাঁচতে! বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভয় পেল তাকে চাকরীতে বহাল রাখতে! কিন্তু এরা! স্বাধীন জাতীয় সরকারের লোকেদের তাকে এত ভয় কিসের! এলো-মেলো দৃষ্টি মেলে অনাদি এস্, বি, ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশবাবুর মুখের দিকে

তাকায়। এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে, এই বেঁটে-খাটো কালো-কোলো লোকটাই তার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। এই লোকটীর অতি বিনীত অনুরোধ তাকে রাখতেই হবে, কেন না এঁর অনুরোধের পেছনে আছে সর্বশক্তিমান সিকিউরিটী এ্যাক্ট। যেতে আপত্তি করলে, ওরা তার ওপর লাঠি চালাতে পারে, গুলিও চালাতে পারে, কারণ সিকিউরিটী এ্যাক্টে সে ক্ষমতা ওদের দেওয়া হয়েছে।

পা তুলতে গিয়ে অনাদির মনে হয় পা দুটো তার যেন মাটীর মধ্যে আধহাত পুঁতে গেছে! শরীরের ওপর ঝাঁকানি দিয়ে চলতে গিয়ে আবার মনে হয়, এভাবে তার যাওয়া হতেই পারে না। কেষ্টবাবু এভাবে যাননি! সুড়সুড় করে পেছন পেছন গিয়ে ওদের জবরদস্তি চালানর লাইসেন্স দেননি! হঠাৎ যেন অনাদির প্রবল এক ইচ্ছা পেয়ে বসে কেষ্টবাবুর মত ফুসফুসের সমস্ত জোর দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, "বন্ধুগণ, যদি মানুষের গৌরব নিয়ে বাঁচতে চান তাহলে এই সর্বনাশা আইনকে বাধা দিন—না হলে মানুষের অধিকার, মানুষের জীবনকে এরা থেঁতলে গুঁড়িয়ে দেবে!' কেষ্টবাবুর সেদিনকার সেই উদাত্ত আহ্বানকে অনাদিরও মনে হয়েছিল ময়দানি বক্তৃতা, ওঁদের বাঁধা গৎ। কিন্তু আজ যেন তার মনের কোন অজানা কন্দর থেকে কেষ্টবাবুর প্রতিটী কথা, রসময়বাবুর কত মন্তব্য কল্‌কল্‌ করে বেরিয়ে আসছে। এতক্ষণে অনাদি মুখ তুলে চায় সামনের দিকে। হাজার জোড়া চোখ যেন তার দিকে অনন্ত কৌতূহলে চেয়ে আছে। তারা যেন জানতে চাইছে, কেন এরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময় জাগে অনাদির, কই ওদের চোখে তো ঘৃণা নেই!

অতি আলতোভাবে ক্ষিতিশবাবু অনাদির পিঠে হাত রেখে বললেন, "একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে অনাদিবাবু—"

ভীড়টা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে চলেছে তুমুল

আলোচনা, অনাদির স্বপক্ষে বিপক্ষে নানান মন্তব্য। মুখ না ফিরিয়েই অনাদি বলে ওঠে, "তা আমি কি করব! দাঁড়ান একটু, মাথাটা আমার ঘুরছে—" উষ্মার একটা ফুলকি ঠিকরে পড়ে অনাদির মধ্যে থেকে।

থানা ইন্সপেক্টর অবনীবাবুর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে। পুলিশের ধড়াচূড়া তিনিই পরে আছেন, অপমানটা যেন সমস্তটা তাঁরই। এতগুলো লোকের সামনে মেজাজ দেখাবে কিনা ফচ্‌কে ওই এক ছোঁড়া! রুখে উঠে তিনি খানিকটা এগিয়ে যান অনাদির দিকে। কিন্তু ক্ষিতিশবাবুর চোখের কোণে খেলে যায় এক ইঙ্গিত। থতমত খেয়ে যান অবনীবাবু। চকিতে একবার চেয়ে দেখেন অপর ফুটপাথে গুঞ্জণরত জমায়েৎ মানুষগুলোর দিকে। মুখখানা ব্যাজার করে হাঁকডাক করে ওঠেন পুলিশগুলোর ওপর। গজ্‌গজ্‌ করতে থাকেন আপন মনে, "দিন দিন কি যেন হচ্ছে দেশটা, পুলিশ, মিলিটারীকেও ভয় পায় না!"

অতি অমায়িক হেসে ক্ষিতিশবাবু অনাদিকে বললেন, "আমাদের আর তাড়া কি, ফিরতে আপনারই দেরী হবে।"

এক ঝটকায় অনাদি মাটির বাঁধন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়, চলতে সুরু করে বলে, "চলুন—' গলার স্বরে তার ঔদ্ধত্যের ঝাঁকানি। এতক্ষণের অনড় স্তব্ধতা যেন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যায়। দমকা হাওয়ার মত অনাদি এগিয়ে যায় এক ঝাপটায়। হন্তদন্ত হয়ে অবনীবাবু খানিকটা এদিক ওদিক করেন, অকস্মাৎ তাড়া দেন পুলিশগুলোকে।

অনাদি এগিয়ে গেছে খানিকটা। ক্ষিতিশবাবু লম্বালম্বা পা ফেলে নাগাল ধরে নিয়েছেন অনাদির। পুলিশেরা উঠেছে সজাগ হয়ে—আর্মড্‌ পুলিশেরা রাইফেলগুলোকে 'সোল্‌ডার্‌ আর্ম' করে নিয়েছে, লাঠিধারীরা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে দৌড়তে সুরু করেছে। সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ান অবনীবাবু, অনাদির দু'পাশে আর পেছনে তিনজন

রাইফেলধারী, লাঠিধারীরা সবার পেছনে। অনাদির জন্যে চক্রব্যূহ রচনা করে চলতে থাকেন অবনীবাবু বীরদর্পে, লম্বা লম্বা হাত দুলিয়ে।

এইবার অনাদি একবার পেছন ফিরে চায়, গতি তার মন্থর হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সেই দলটাও চলতে সুরু করেছে—আছে তার মধ্যে মেয়ে পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ভদ্রলোক আর বস্তিবাসী, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী। তারাও চলেছে! অনাদি দেখলে, তারাও আসছে তারই সঙ্গে সঙ্গে! কিন্তু ও মানুষগুলোকে অনাদি চেনে না, জানে না, আলাপ করেনি কোনদিন ওদের সঙ্গে, জানবার আগ্রহও জাগেনি কোনদিন ওই মানুষগুলো কি করে, কেমন করে বাঁচে! কিন্তু ওরা তারই প্রতিবেশী।

আড়চোখে অনাদি দেখে নেয় তার সামনে, ডাইনে আর বাঁয়ে—সব দিকেই রাইফেলধারী প্রহরী। কেমন যেন একটা মজা অনুভব করে অনাদি। আচ্ছা, ঝপ্ করে সে যদি দাঁড়িয়ে পড়ে? তাহলে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়বে। আচ্ছা, ওই মানুষগুলো যদি গ্রেফতারের প্রতিবাদে পুলিশের পথ আগলে দাঁড়ায়? তাহলে ওরা গুলি চালাবে। আর কালকের কাগজে বড় বড় হরফে খবর বেরোবে, 'মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কমিউনিষ্ট গুণ্ডাদলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পুলিশ কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়।' অনাদির মনে কেমন যেন খোঁকা লাগে, খবরগুলো কি এমনই ভাবে তৈরী হয়!

গলিটা পার হয়ে ওরা এসে পড়ল বড় রাস্তায়। ঠিক মোড়ের ওপর বিড়ির দোকানটার সামনে চলেছে ঘোরতর তর্কবিতর্ক। ওরা এসে পড়তেই স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষগুলো। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে কেউ কেউ অনাদির দিকে, আর কেউ কেউ সরে গিয়ে একটু তফাতে তফাতে ছড়িয়ে দাঁড়ায়। যদিও ওদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, কমিউনিষ্টদের ধরে জেলে পোরাই উচিত।

বিড়ির ওই দোকানটা থেকে অনাদি বিড়ি কেনে দিনে দু'বার। সকালে অফিস যাওয়ার সময়ে দু'পয়সার আর দু'পয়সার রাতের বেলায় ফেরার পথে। বিড়িওয়ালা লোকটা বেশ, সদাই তার ঢুলুঢুলু আঁখি আর কথা কইতে হলেই মেজাজ গরম। বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভুঁড়িওয়ালা একটা লোকের কথা শোনা যায়, "আরে, এ লোকটা কম্‌নিষ্ট আছে—"

খেঁকিয়ে ওঠে ঢুলুঢুলু আঁখি বিড়িওয়ালা, "কম্‌নিষ্ট আছে তো কি হয়েছে? বাবু বড় ভাল লোক আছে—আমাকেও 'আপনি' বলে। মানুষকে ওরা ইজ্জৎ দেয়।"

অনাদির কানে ছিটকে আসে কথাগুলো। মরিয়া হয়ে ওঠে অনাদি। অন্তত এই লোকটার কাছে প্রমান করার দরকার আছে যে, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেলেও ভয়ে সে ঘাবড়ে যায়নি। হঠাৎ থেমে পড়ে ক্ষিতিশবাবুকে বললে, "দাঁড়ান একটু, পয়সা দুয়েকের বিড়ি কিনে নিই—" ক্ষিতিশবাবুকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই সে এগিয়ে গেল দোকানের দিকে।

কিছু যেন একটা অনর্থ ঘটে গেল এমনই একটা ভাব করে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন অবনীবাবু। ক্ষিতিশবাবু ইশারা করেন দুজন লাঠিধারী পুলিশকে। লাফ মেরে তারা উঠে পড়ে ফুটপাথের ওপর, গিয়ে দাঁড়ায় দুজনে অনাদির দু'পাশে। সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠে বিড়ির দোকানদার, "ক্যা, বাবু ক্যা চিড়িয়া হ্যায়! থোড়া ফরক্ পড়নেসে উড় যায়গা?"

ধমক দিয়ে ওঠে একজন পুলিশ, "চুপ রও শালা—"

কাঁধদুটো কুঁচকে হাত ছড়িয়ে বলে ওঠে বিড়িওয়ালা, "দেখলেন তো বাবু, একটা বাত্ ভি বলবার উপায় আছে না—" হাতের বিড়ি তার হাতেই রয়ে যায়, ভুল হয়ে যায় খরিদ্দারকে জিনিষ দিতে। হঠাৎ

সে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, "ইয়ে কৌন সি কানুন হ্যায়! পুলিশ হ্যায় তো ক্যা! ভালা আদমীকো ভি শালা ঔর চোর দাগাবাজকো ভি শালা!" বিস্ময়ে তার সদা-অর্ধনিমিলিত চোখ দুটো গোল হয়ে ওঠে।

অপর সিপাইটী তাড়া করে, "লে, ঝট্‌পট্‌ বাবুকো চীজ দে—"

আস্ত বাণ্ডিলটা খুলে দু'পয়সার হিসাব আর করা হয় না দোকান-দারের। পুরো বাণ্ডিলটা গুঁজে দেয় অনাদির হাতের মধ্যে, একটা দেশলাইও সেই সঙ্গে দিয়ে দেয়। ত্রস্ত বলে ওঠে, "চলে যান বাবু জলদি জলদি, আর বাত্‌ করে কাম্‌ নেই, এ শালা দুনিয়া বহুৎ খারাপ হয়ে গেছে—"

ফিরে আসে অনাদি পুলিশ ব্যূহের মধ্যে। হাঁফ ছেড়ে অবনীবাবু আবার চলতে সুরু করেন। অনাদি বারবার চেয়ে চেয়ে দেখে সদা অর্ধনিমিলিত আঁখি বিড়িওয়ালার দিকে—সে তখনও তার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসছে!

অনাদির পায়ের কাঁপুনি এবার যায় থেমে, হাঁটুতে যেন সে বেশ জোর পাচ্ছে। পুলিশে ধরলেই তাহলে মানুষে তাকে চোর ছ্যাচোর মনে করে না! তারাও বিচার করে, কে কি, কাকে কেন ধরেছে! তাই এই বিড়িওয়ালার কাছে একজন কমিউনিষ্ট তার আপনার লোক! পেছন ফিরে আরও একবার চেয়ে দেখার কৌতুহল দমন করতে পারে না অনাদি। দেখে, বিড়ির দোকানের মোড়ে তখনও চলেছে জটলা, ছোট ছোট দলে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে, সমস্ত জায়গাটা জুড়ে।

রাস্তা দিয়ে পুলিশ বেষ্টিত হয়ে চলতে চলতে অনাদির আর সঙ্কোচ লাগেনা। দুধারের লোক কেমন যেন থমকে যাচ্ছে তাদের দেখেই। প্রথমটা উঠছে চমকে, তারপর বেদনায় করুণ হয়ে উঠছে তাদের মুখ।

বহুলোক রাস্তায়, কেউ গঙ্গাস্নান করে ফিরছে স্তোত্র পাঠ করতে করতে, আর কেউ ফিরছে বাজার করে। দোকানপাট ধীরে ধীরে খুলছে, শহর যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। রাস্তায় জল দিচ্ছে কর্পোরেশনের লোক নিতান্ত দায়সারা ভাবে—বেরিয়েছে ধাঙড়ের গাড়ী ময়লা কুড়োবার জন্যে। এমন সময় অনাদি রোজই বেরোয় সকালের টিউশনিটা সারবার জন্যে। তার ছাত্রের ঘুম নিশ্চয়ই এখনও ভাঙেনি, আর ভাঙবার কথাও নয়! ছাত্রের পিতার নির্দেশ, মাষ্টার মশাইকে গিয়ে ভোর বেলা তাঁর পুত্রের ঘুম ভাঙাতে হবে। আহা, ধনীর দুলাল, ননির পুতুল ছাত্রটী তার বোধহয় এখনও ঘুমিয়ে আছে!

চলতে চলতে অভ্যাসবশে অনাদি পকেটে হাত চালিয়ে দেয়। কিন্তু চমকে ওঠে একটি আস্ত বাণ্ডিলের স্পর্শ পেয়ে। তাহলে ওই বিড়িওয়ালাও তাকে কমিউনিষ্ট মনে করেছে! আশ্চর্য লাগে অনাদির, পুলিশও তো তাকে ধরতে এসেছে কমিউনিষ্ট সন্দেহে! একই জিনিষের ওপর পুলিশ আর সাধারণ মানুষের মনোভাবে এমন দুস্তর প্রভেদ কেন!

কিন্তু সে তো কমিউনিষ্ট নয়। ইচ্ছে করলে অবশ্য হতে পারত; কিন্তু হয়নি সে ইচ্ছে করেই, কোন তাগিদ জাগেনি তার মনে। তার তখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'! মায়ের ওই চিঠির পর চিঠি—তার কথাগুলো যেন মড়াকান্নার মত সুর ধরে তার পেছনে তাড়া করে বেড়িয়েছে, 'আমাকে নিয়ে যা বাবা—আর যে আমি পারি না—' কিন্তু কোথায় নিয়ে আসবে সে। ভাবের আবেগে, উচ্ছ্বাসের অতিশয্যে সে-ও মাঝে মাঝে ভেবেছে, 'কুছ্ পরোয়া নেই—নাহয় ফুটপাথে থাকব।' কিন্তু কলকাতা শহরে লাটপ্রাসাদের রেলিঙের ধারে যখন সে দেখে, শিশুকে একটা ন্যাকড়ায় শুইয়ে তার মা-কে এক গলা ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষে চাইতে—মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে যখন দেখে জোয়ান একটা মানুষকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মরে থাকতে; আর বৃহৎ

অট্টালিকার সামনে ডাষ্টবীন্ থেকে মানুষে আর কুকুরে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে ; তখন তার ভাব আর উচ্ছ্বাস যায় উবে, ইচ্ছে হয় দুর্বাসার মত কঠিন অভিশাপ দেয় এই পৃথিবীটাকে।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়ে অনাদি রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ খুঁজে পায়নি। দেখেছে সে জনকয়েক কমিউনিষ্টকে, যেমন রসময়বাবু, কেষ্টবাবু। লোকগুলি ভাল, সত্যিই ভাল লেগেছে তার, কিন্তু কমিউনিষ্ট হওয়ার জন্যেই ভাল কিনা, এ প্রশ্ন অনাদির মাথায় কোনদিন আসেনি। কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে অদ্ভুত যে ধারণাগুলো ছিল, সেগুলো কেটে গেছে ওঁদের সান্নিধ্যে এসে, শ্রদ্ধা করেছে তাঁদের, ওঁদের অনুরোধে দু'চার আনা চাঁদাও দিয়েছে। কেষ্টবাবু যখন সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসখানা কেনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তখন শ্রদ্ধার বশবর্তি হয়েই সে একটা টাকা খরচ করেছিল।

ট্রাম রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশে হাত দেখিয়েছে। অবনীবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটাই। আশেপাশে আর কিছু লোক অপেক্ষা করছে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে। তারই মধ্যে থেকে কে যেন বেশ একটু জোরেই বলে উঠল, "আর কি, দফা শেষ—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।" কথাটা শুনে চমকে ওঠে অনাদি। যে অমঙ্গল সূচনা বার বার তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল, তাকে সে দমিয়ে রেখেছে এতক্ষণ। পুলিশ রিপোর্টে একবার তার চাকরী গিয়েছিল, আবার তার ওপর সেই পুলিশেরই হানা! 'না, না—এ পুলিশ সে পুলিশ নয়'—প্রাণপণে তার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চায় অনাদি, 'এ গভর্ণমেণ্ট সে গভর্ণমেণ্ট নয়—তারা ছিল বিদেশী লুণ্ঠনকারি বণিক, আর এঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।'

ট্রাফিক পুলিশ হাত নামাল। অবনীবাবু চলতে সুরু করলেন। কিন্তু প্রথম ধাপ নিতে গিয়ে অনাদির মাথাটা যেন ঘুরে যায়। খপ্

করে ধরে ফেলে তার পাশে পাশে চলা ক্ষিতিশবাবুকে। ক্ষিতিশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল অনাদিবাবু?" অনাদির মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে ক্ষিতিশবাবুর মুখের দিকে। আর একটু অনাদির কাছ ঘেঁষে এসে ক্ষিতিশবাবু বললেন, "ভয় কি আপনার, যা জানেন অকপটে বলে যাবেন, হোম্‌ ডিপার্টমেণ্ট নিশ্চয়ই আপনার ওপর সুবিচার করবে। এখনতো আর বৃটীশ আমল নেই যে, মানুষকে অযথা হয়রাণ করবে—" তারপর আরও কত কি যে বলে যান ক্ষিতিশবাবু, তার একটি বর্ণও অনাদির কানে যায় না। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় অফিসে একদিন কেষ্টবাবুর সঙ্গে তুমুল তর্কের কথা। কেষ্টবাবু বলতে চেয়েছিলেন, ভারত থেকে বৃটীশ আধিপত্য এখনও শেষ হয়নি। এ কথায় যেন ভিমরুলের চাকে ঘা পড়েছিল। অফিসশুদ্ধ প্রত্যেকে ক্ষেপে গিয়ে কেষ্টবাবুকে যা'তা' গালিগালাজ করেছিল। তবুও কেষ্টবাবু বলেছিলেন, 'তার প্রমাণ বৃটীশ আইন আর বৃটীশ আই, সি, এস্'রা সমান সম্মানে আজও বহাল রয়েছে, বৃটীশের পুঁজি আর বৃটীশের কারবার তেমনই অক্ষত রয়েছে, তাছাড়া কমন্‌ওয়েল্‌থের অক্টোপাশ আজও আমাদের আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানেন, বৃটীশ আছে ঠিকই, তবে ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়ালের পিছনে, তাই আমরা চোখের ওপর সব সময়ে দেখতে পাচ্ছিনা।'

কথাগুলো সেদিন অনাদি আমল দেয়নি। উপরন্তু তার মনে করুণা জেগেছিল কেষ্টবাবুর ওপর—বেচারী লোকটী ভাল কিন্তু মাথাটা একেবারেই খারাপ! সেই কেষ্টবাবুর কথাগুলো মনে পড়তেই অনাদি ক্ষিতিশবাবুকে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, আপনি বৃটীশ আমলেও তো এই চাকুরী করতেন?"

একটু যেন থতমত খেয়ে গিয়ে ক্ষিতিশবাবু বলেন, "না, কেন বলুন তো?"

"আপনি না করতে পারেন, অন্য যাঁরা করতেন তাঁরা আজও আছেন ?" অনাদি তার প্রশ্ন চালিয়ে যায়।

ক্ষিতিশবাবু বললেন, "আছেন বৈকি।"

আপন মনেই অনাদি বলে ওঠে, "কিন্তু নতুন সরকারের উচিত ছিল তাদের দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া। দেশের সঙ্গে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারাই—"

"তাই নাকি!" হাসির একটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে ক্ষিতিশবাবুর চোখে মুখে, "আপনার এ কথাটা কিন্তু কমিউনিষ্ট মার্কা হল অনাদিবাবু—এ ব্যাপার নিয়ে ওরাই সবচেয়ে বেশী হৈচৈ করে।"

সাত

থানায় পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অনাদির লাগল এক হোঁচট। সেই মুহূর্তে সে একবার পেছন ফিরে সকালের জলে ধোয়া চওড়া পিচ ঢালা রাস্তাটা শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল। কেন যেন অনাদির মনে হয়েছিল, কড়াবেড়ি চিহ্নিত প্রাসাদোপম ওই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকলেই ওই পিচ ঢালা প্রশস্ত রাস্তাটার সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ!

টাল সামলে নিয়ে অনাদি সিঁড়ি কটা উঠে পড়ল। সামনেই চওড়া একটা বারান্দা, পার হয়েই একটা ঘর। ঘরের মধ্যে পৌঁছে অনাদিকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামনে তার অবনীবাবু আর ক্ষিতিশবাবু। অবনীবাবু গটমট করে এগিয়ে গিয়ে ডাইনে একটা স্থইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন, আর ক্ষিতিশবাবু কোঁচাটা ঝেড়ে নিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন আরও খানিকটা সোজা, তারপর ডাইনে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনাদি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একা। মুহূর্তের

মধ্যে সিপাই শান্ত্রীরা কোথায় যেন উবে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনাদি সেই বিরাট বাহিনীর কোন চিহ্নও দেখতে পেলে না।

চেনা মুখগুলো সরে যাওয়াতে অনাদির কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে হতে থাকে। এ দুনিয়াটায় সে সত্যিই অসহায়! এখানকার পথঘাট, রীতিনীতি কিছুই তার জানা নেই। কিন্তু এরপর সে কি করবে সেটা তো জানা দরকার। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে অনাদি একটা মানুষের মুখ।

কাপড়ের ওপর পুলিশী কোর্তা পরা এক সিপাই বেরিয়ে এল সুইং ডোরটা ঠেলে একটা ঝাড়ন হাতে করে। অনাদি কথা বলবার জন্যে মুখিয়ে উঠল। কিন্তু সিপাইটী একবার তার দিকে ফিরেও তাকাল না, ভ্রুক্ষেপও তার নেই ঘরের মধ্যে আরও একটী মানুষ আছে কি নেই। আপন মনে সে টেবিল চেয়ার ঝাড়-মোছ সুরু করে দিলে।

এক মিনিট, দু'মিনিট—সেন্ট টমাসের ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করে চলেছে। বহু পুরণো ঘড়ি—ওটাও বোধহয় বৃটীশ আমলের! ঘড়ির দেয়ালে আরও খানিকটা ডাইনে ধূলোপড়া দেয়ালে চৌকো খানিকটা জায়গা হঠাৎ সাদা ধব্‌ধব্ করছে। আর সেই জায়গায় গান্ধিজীর একটি ফটো। নতুন ফটোটা সমস্ত সাদা জায়গাটা ঢেকে দিতে পারেনি, পুরণো আমল যেন মাথা উঁচিয়ে তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই সাদা জায়গাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনাদির ঠোঁটটা ঈষৎ হাসিতে কুঁচকে ওঠে, আহা, ওখানে বোধহয় রাজারাণীর বিরাট একটা অয়েল-পেন্টিং ছিল!

অনাদি দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে আর কাপড়ের ওপর কোর্তা পরা সিপাইটী গভীর মনোযোগে তার কাজ করে যাচ্ছে। হুস্‌স্ করে একখানা ট্রাম বেরিয়ে গেল সদর রাস্তা দিয়ে। চকিতে অনাদি ঘুরে দাঁড়াল—ঘরের চৌকাঠ থেকে মাত্র হাত চারেক ভেতরে সে রয়েছে

দাঁড়িয়ে। চৌকাঠ থেকে বারান্দাটাই বা আর কতটা! হোক্ আরও চার হাত। তারপর তিনটে সিঁড়ি নামলেই সদর রাস্তার ফুটপাথ্! হঠাৎ যেন অনাদির মনটা আন্‌চান্ করে ওঠে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কাপড়ের ওপর কোর্তাপরা সিপাইটা বোধহয় তাকে কোন কথাই বলবে না; ওর কাজ যে দপ্তর ঝাড়মোছ করা!

ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে ফোন থানা-ও, সি'র ঘরে। অযথা গলা চড়িয়ে কে যেন চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছে, হ্যাঁ, না, আচ্ছা—

পালানর প্রশ্নটা হঠাৎ মাথায় এসে পড়লেও প্রশ্রয় দেয় না অনাদি ও চিন্তাটাকে। পালিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার কত গল্পই যে হুড়মুড় করে মাথার মধ্যে ঢুকে হট্টগোল সুরু করে দেয়—তবুও অনাদি অটল। ইচ্ছে হলেই যে সব কাজ করা যায় না, তা সে ভালভাবেই জানে। ইচ্ছে কি তার হয়নি সুন্দরভাবে বাঁচতে, ভাল খেয়ে, ভাল পরে, নিজের একটা আস্তানায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে! কিন্তু সে কথা বলতে গেলে তো লোকে তাকেই পাগল বলবে।

রাস্তা থেকে চট্ করে চোখ সরিয়ে নেয় অনাদি। ঝাড়-মোছওয়ালা সিপাইটা ততক্ষণে দক্ষিণের জানলাগুলো দিয়েছে খুলে। অনাদির চোখ সামনাসামনি জানলার মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়ে থানা চৌহদ্দির মধ্যে। পাঁচিলের গা ঘেঁষে একটা কুস্তির আখড়া। দুজন লোক তখন দুটো মহিষের মত দুজনের মাথায় মাথা লাগিয়ে সামনে পেছনে ঠেলাঠেলি করছে। একজন আখড়ার পাড়ে বসে মুঠো মুঠো মাটী নিয়ে বুকে পিঠে মাখছে। আর একজন বাঁশের একটা খুঁটি ধরে বিরতিহীন বৈঠকিরি দিয়ে চলেছে। অনাদির বেশ লাগে দেখতে। অসীমদাও এমনই একটা ব্যায়ামাগার খুলেছিলেন। সেখানেও কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু শেখান হত। কিন্তু সে ব্যায়ামাগারকে নোটীশ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল এই পুলিশেরাই! অবাক লাগে

অনাদির, অথচ পুলিশদের জন্যে থানার মাঝ-মধ্যিখানে আখড়া, আবার শক্তিচর্চার জন্যে মাসিক দশ টাকা দুধের এ্যালাওয়েন্স! দুই আমলের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে অনাদি তুলনা না করে পারে না—সে আমলে বৃটীশ সরকার সাধারণ মানুষের শক্তিচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল আর এ আমলে জাতীয় সরকার পুলিশকে দুধ খাইয়ে শক্তিশালী করছে। আবার সেই কেষ্টবাবুর কথাটাই ঘুরে ফিরে মনের ওপর জাঁকিয়ে বসতে চায়।

খট্‌খট্‌ করে জুতোর আওয়াজ হতেই অনাদি সচকিত হয়ে ওঠে। এই বাড়ীটায় পদার্পণ করার পর থেকেই কেমন যেন সে কাবু হয়ে গেছে। সকলকেই, সব কিছুকেই কেমন যেন ভয় ভয় করছে। জুতোর আওয়াজটা চেনা মনে হয়, অবনীবাবু বেরিয়ে আসছেন তাঁর খাস্‌-কামরা থেকে। যথাসম্ভব সোজা আর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় অনাদি। আর সামনের সিপাইটা তখনও অখণ্ড মনোযোগে টেবিল, চেয়ার, শেল্‌ফ্‌, ঝাড়-মোছ করে চলেছে।

অবনীবাবু বাইরে এসে অনাদিকে দেখেই চমকে উঠলেন। রাস্তা থেকে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড এক হাঁক পাড়লেন, "দরোয়াজা—"

অবনীবাবুর সে রব শুনে অনাদির বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে—বুঝিবা এখনই তার ফাঁসির হুকুম দিয়ে দেন!

ভেতর থেকে একটা পুলিশ পাগড়ীটা মাথায় বসাতে বসাতে গজেন্দ্রগমনে এল বেরিয়ে। সামনে এসে দাঁড়াতেই অবনীবাবু গর্জন করে উঠলেন, "কিধর্‌ থা তুম্‌?" পুলিশটা কোন জবাবই দেয় না, আপন মনেই সে পাগড়ীটা মাথায় বসিয়ে আলতোভাবে দুটো হাতে এদিক-ওদিক একটু-আধটু উঠিয়ে নামিয়ে দিতে থাকে। অবনীবাবুর ঝাঁঝ আরও বেড়ে যায়, "তুম্‌লোগ্‌ শালা ইনডাল্‌জেন্স পায় পায়কে

মাথা পর উঠ্‌ গিয়া হ্যায়—লাথ্‌ মারকে হিঁয়াসে নিকাল দেগা—”
হিন্দীভাষাটাকে ইচ্ছে করেই আয়ত্ত করেননি অবনীবাবু। পুলিশ বিভাগে হিন্দুস্থানীরা সাধারণত সিপাই, কন্‌স্টেবলই হয়ে থাকে। তাঁর নিম্নপদস্থের ভাষা শিক্ষা করা অবনীবাবুর কাছে নিতান্তই অপমানজনক মনে হয়েছে।

অবনীবাবুর এত তর্জন-গর্জনে খুব যে ভয় পেয়েছে, দরোয়াজার হাবভাবে মোটেই তা প্রকাশ পায় না। পকেট থেকে চাবির একটা গোছা বার করে বললে, “ইস্‌কো লে যায়গা ?”

“তব ! বাবু আধাঘণ্টা হিঁয়া পর খাড়া হ্যায়—” সঙ্কোচ একটা ভাব ফুটে ওঠে অবনীবাবুর কথায়।

দরোয়াজা বুঝে নেয় ফাটকের আসামী নয় অনাদি। চাবির গোছাটা পকেটে চালিয়ে দিয়ে ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, “আইয়ে—” নির্বিকারভাবে সে চলতে আরম্ভ করে অন্ধকার গলিটার দিকে। কুণ্ঠিত স্বরে অবনীবাবু বললেন, “যান ওর সঙ্গে, ঘরে গিয়ে বসুন। ক্ষিতিশবাবু এখনই আপনার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলবেন।”

দরোয়াজাকে অনুসরণ করে অনাদি। অফিসঘর পার হয়েই সরু গলি, দিনের বেলাতেও অন্ধকার। গলির বাঁয়ে লোহার ফটকওয়ালা সারি সারি অন্ধকার খুপরি, সব কটারই দরজায় বড় বড় তালা। গারদ-গুলোর মধ্যে কোনটায় লোক আছে আর কোনটায় নেই বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। গোঙানির একটা শব্দ শুনে চকিতে অনাদি দ্বিতীয় গারদটার দিকে ফিরে চায়। জনতিনেক লোক লোহার শিকগুলোর ওপর মুখ চেপে ধরে অফিসঘরের মধ্যে দৃষ্টিটাকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাত্রের কেস্‌ ওগুলো। ইন্সপেক্টর সাহেবের দেখার ফুরসৎ হয়নি এখনও। এইবার হয়তো ওদের ডাক পড়বে। ইন্সপেক্টর সাহেবের মেজাজের ওপর নির্ভর করছে ওদের ভাগ্য। মেজাজ যদি

তাঁর খুশ থাকে তাহলে মদো-মাতালগুলো দু'চার হাত নাক-খৎ দিয়েই খালাস পাবে। আর মেজাজ যদি থাকে বিগড়ে, তাহলে সব চালান।

ফাটকগুলোর মধ্যে চেয়ে দেখতে দেখতে চলেছিল অনাদি। এ যেন এক আজব জগৎ! শেষ গারদটার সামনে যেতেই একটা হাত গরাদের ফাঁক দিয়ে অনাদির জামাটা চেপে ধরল খপ করে। থমকে অনাদি দাঁড়িয়ে পড়তেই একটা স্বর গেঙিয়ে উঠল, "হেই বাবু, আমার ট্যাকাগুলো ফিরিয়ে দে বাবু—"

হতভম্ব হয়ে পড়ে অনাদি। জামাটা যে টান্ মেরে ছিনিয়ে নেবে, সে শক্তিটুকুও তার নেই। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে অন্ধকার গারদের মধ্যে লোকটার মুখ চেনবার চেষ্টা করে। আবার লোকটা অনুনয় বিনয় করে ওঠে, "দে বাবু, ফিরিয়ে দে আমার দশটা ট্যাকা। ওই শালা পুলিশটা আমার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলে বাবু। আমি চুরি করিনি বাবু, দোস্তের কাছ থেকে কর্জ করে আনছিলাম বাবু—"

গদাই-নস্করি চালে চলতে চলতে দরোয়াজা গিয়েছিল খানিকটা এগিয়ে। দরজার সামনে পৌঁছে তার খেয়াল হয়, আসামীর সঙ্গে তার ফারাক্ পড়ে গেছে অনেকখানি। ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে, সেই গজেন্দ্রগমনেই এগিয়ে আসে অনাদির দিকে অনাদির পাশে দাঁড়িয়ে এক পলক চেয়ে দেখে ফাটকে বন্ধ আসামীর দিকে। হঠাৎ পকেট থেকে চাবির গোছাটা বার করে ঝপ্ করে কশিয়ে দেয় এক ঘা লোকটার কব্জির ওপর, "ছোড় দে শালা—"

ভেতর থেকে লোকটা ককিয়ে উঠে ছেড়ে দেয় অনাদির জামা। জলদ গম্ভীর স্বরে দরোয়াজা অনাদিকে বলে, "আইয়ে—" হন্‌হন্ করে অনাদি চলতে থাকে দরোয়াজার পেছন পেছন। অন্ধকার গলিটার মধ্যে মুখ-না-দেখা সেই লোকটির শাপমন্তি আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে বেড়ায়, "ওলাউঠা হোক শালাদের—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরুক শালারা—"

ঘরের মধ্যে ঢুকে অনাদি দেখে, ক্ষিতিশবাবু টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খস্‌খস্‌ করে লিখে চলেছেন। বারেক তার দিকে চোখটা তুলে তখনই আবার নামিয়ে নিলেন। খানকয়েক টেবল লম্বালম্বি সারি দিয়ে পাতা, তার একদিকে একখানা লম্বা বেঞ্চ আর অপর দিকে খানকয়েক চেয়ার। অনাদি বেঞ্চটার ধারের দিকে আলগোছে বসল। অদ্ভুত এক ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। লোকটা যে চীৎকার করে শাপমন্যি দিচ্ছে, তার জন্যে তো বিচলিত হতে দেখা যাচ্ছে না কাকেও! তাহলে ওর টাকা দশটা গেল কোথায়! ও তো নালিশ করবে অবনীবাবুর কাছেও। কিন্তু অবনীবাবু কি বলবেন সেই পুলিশটাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে? ভালভাবে ঠাহর করে অনাদি দেখতে থাকে ক্ষিতিশবাবুর মুখখানা। এই তো, এই ভদ্রলোকই তো এখন তাকে চিনতেই পারছেন না! তাহলে অবনীবাবুই বা কেমন করে বিশ্বাস করবেন একজন আসামীর কথা। আমলই হয়তো দেবেন না ও বেচারীর কথায়। দরোয়াজার কুস্তিগীর হাতে কড়া দুটো রদ্দা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ও যাবে বেরিয়ে। তারপর কি ভাগাভাগি হবে ওই দশটা টাকা! কার ভাগে কত পড়বে? অবনীবাবুরও কি একটা ভাগ আছে নাকি?

সশব্দে ক্ষিতিশবাবুর খাতা বন্ধ করার আওয়াজে অনাদি চমকে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিতিশবাবু হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়েছেন মাথার ওপরে, শরীরটার ওপর ডাইনে বাঁয়ে মোচড় দিয়ে খানিকটা আড়ামোড়া ভেঙে নিচ্ছেন। আরামে চোখ দুটো বুজে এসেছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অব্যক্ত এক শব্দ। আহা বেচারী, সেই কোন মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠেছেন!

এতক্ষণে যেন ক্ষিতিশবাবুর চোখ পড়ল অনাদির ওপর। চোখ দুটো বড় বড় করে দেখে নিলেন একবার সমস্ত ঘরখানা। হঠাৎ যেন

তিনি চমকে উঠলেন, কি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে। বিস্ময়ে হাঁ করে বলে ওঠেন, "এ্যাঁ! দেখেছেন একবার কাণ্ডটা!"

হতচকিত হয়ে অনাদিও ঘরটার ওপর ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে। ক্ষিতিশবাবু হাঁক পাড়েন, "দরোয়াজা, দরোয়াজা, এই দরোয়াজা—" উত্তরোত্তর স্বরের পর্দা চড়তেই থাকে। দরোয়াজা এসে দাঁড়াতেই ক্ষিতিশবাবু হুকুম দেন, "জল্‌দি পাঙ্খা চালাও—"

এবার অনাদি সত্যিই বোকা ব'নে যায়। ভদ্রলোক কি তার সঙ্গে রসিকতা করছেন! ক্ষিতিশবাবু সবিনয়ে বললেন, "আপনি পাখার তলায় এসে বসুন অনাদিবাবু। আমি দেখে আসি কতদূর কি হল।"

কোন কথা না বলে অনাদি বেঞ্চের পিঠে হেলান দিয়ে বসল। মুচকে হেসে ক্ষিতিশবাবু বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। দরজার সামনে পৌঁছে অকারণে দরোয়াজার ওপর উঠলেন ঝাঁঝিয়ে, "হিঁয়া পর্‌ খাড়া রহো, বাবুকা কোই চীজ্‌কা জরুরৎ হোগা তো ফওরণ হামারা পাস্‌ আও—"

ক্ষিতিশবাবু গেছেন চলে। দরজায় মোতায়েন রয়েছে দরোয়াজা। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে। তবুও যেন অনাদির শরীরটা ঘেমে উঠছে। সন্দেহ জাগছে নানান রকম, ভয়ে বারবার মনটা উঠছে কেঁপে। এখানে পৌঁছবার পর অবনীবাবু হয়ে গেছেন উদাসীন, তাঁর কাজ যেন শেষ হয়ে গেছে। এখন সে সম্পূর্ণই ক্ষিতিশবাবুর খপ্পরে! অবনীবাবুকে বোঝা যায়, কিন্তু ক্ষিতিশবাবুর মনের নাগালই যেন পাওয়া যায় না।

আধঘণ্টার ওপর পার হয়ে গেছে, কিন্তু স্টেটমেণ্ট নেওয়ার কোন লক্ষ্যণই তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'ই সত্যি হল! সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অনাদি। যে কথাটা মনের অতল থেকে ঠেলেঠুলে বারবার ওপরে উঠে আসতে চাইছে, সেইটাই কি সত্যি?

আবার, আবার অনাদি প্রাণপণে তার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। এমন হতেই পারে না। কমিউনিষ্ট বলে নিছক সন্দেহের বশে তাকে সিকিউরিটী এ্যাক্টে আটক করতেই পারে না—একটা আইনের দোহাই দিয়ে এমন যথেচ্ছাচার একটা সভ্য দেশে কিছুতেই চলতে পারে না। আটক হওয়া মানে চাকরী যাওয়া। আর ওই যাট টাকা মাইনের চাকরী—ওইটাই তার জীবনের সম্বল, তার একমাত্র মূলধন—ওই মূলধনের ওপর ভরসা করে জীবনের ইমারত্ গড়ার পরিকল্পনা করেছে। এমন কি শুধু কমিউনিষ্ট হওয়ার জন্যে রসময়বাবুর মত মানুষকেও সে এড়িয়ে চলেছে!

রসময় সেন যুবক বয়েসে সন্ত্রাসবাদী দলের গোপন গণ্ডিতে এসে যায়—বালক বয়সের ফাই-ফরমাস খাটার পর্ব তখন তার শেষ হয়েছে। ফেরারী কয়েকজন কর্মির আস্তানা আগলানর ভার পড়ল তার ওপর। রসময় গৌরব বোধ করেছিল তার ওপর 'দাদা'দের আস্থা দেখে। কিন্তু এই সময়েই ঘটল একটী ঘটনা! সেদিন শহরে একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। এক ভদ্রলোক মনিবের কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গদিতে। অপেক্ষাকৃত নির্জন আর অন্ধকার এক জায়গায় জনকয়েক যুবক রিভলভার দেখিয়ে তাকে চেপে ধরে আর আহত অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে যায়। পরে রসময় জানতে পারে একাজ তারই দলের। ঘটনাটী রসময়কে চঞ্চল করে তোলে, সোজাসুজি সে প্রতিবাদ জানায়, 'এ কাজ আমাদের ঠিক হচ্ছে না, এতে আমরা দেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারাব।' উত্তর পেয়েছিল সে, 'সাধারণ মানুষকে এটুকু সহ্য করতেই হবে, না হলে স্বাধীনতা তো আর আকাশ থেকে পড়বে না।' রসময়ের মন ভরেনি এ উত্তরে, ভেবে পায়নি সে, দেশশুদ্ধ মানুষকে বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকজন যুবক কেমন করে বৃটীশকে তাড়াবে! সরে আসে সে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে। দেখলে, খুন জখম করে

লুঠ করা টাকায় এল অনেক বোমা পিস্তল, মরল অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ অফিসার, কিন্তু বৃটীশের মসনদ টলল না এক তিলও! ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে প্রাণ দিল অনেক তাজা তরুণ প্রাণ, সাধারণ মানুষ সহ্য করল বৃটীশ দমননীতির অমানুষিক নির্যাতন, কিন্তু দেশের ভাগ্যে ঘটল না কোন পরিবর্তন। রসময়ের মনে হয়, এপথে হবে না—চাই অন্যপথ। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ সে পড়তে থাকে। শ্রমিকদের সংগঠিত করে একদল মানুষ চেয়েছিল বৃটীশকে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে! রসময়ের মনে হয়েছিল, এ যেন এক অদ্ভুত পাগলামী। শ্রমিক! অর্ধভুক্ত, অশিক্ষিত, অসভ্য ওই মানুষগুলো আনবে স্বাধীনতা! রসময় লক্ষ্য করতে আরম্ভ করে শ্রমিকদের জীবন। শ্রমিকদের সভায় পেছনে দাঁড়িয়ে শোনে শ্রমিক নেতাদের বক্তৃতা। এমনই একটা সভায় আলাপ হয় তার শ্রমিকনেতা জাফর আহমদ-এর সঙ্গে। প্রচণ্ড তর্ক, প্রবল বাক্‌বিতণ্ডা চলে জাফর আহমদ-এর সঙ্গে দিনের পর দিন। শ্রমিক, যারা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যাদের নেই কোন চাল-চুলো, তারা কেমন করে বিপ্লব সফল করতে পারে! রসময়ের এ প্রশ্নের উত্তর মিলল প্রত্যক্ষভাবেই তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। কারখানায় লাগল ধর্মঘট। শ্রমিকরা দাবী করেছে মাইনে বাড়ানর। দিনের পর দিন কারখানা বন্ধ। পুলিশ এসে বস্তিতে বস্তিতে করছে হামলা, শক্তসমর্থ মানুষগুলোকে নিয়ে গিয়ে পুরছে জেলে। তবুও মেশিনের চাকা বন্ধ। প্রতিদিন সভা আর মিছিল। তারই মাঝে রসময়ও ভেসে যায় প্রবল এই শক্তির বন্যায়। শ্রমিকদের দাবি মানতে বাধ্য হয় কারখানার মালিক—শক্তসমর্থ মানুষগুলোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। সেদিন রসময় স্বপ্ন দেখেছিল সারা ভারত জুড়ে গড়ে উঠবে শ্রমিকের সংগঠন, তারই দেখাদেখি সংগঠিত হবে কৃষক, মধ্যবিত্ত—অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক

চেতনায় হয়ে উঠবে উদ্বুদ্ধ। বিপ্লব সফল হবে শ্রমিকের নেতৃত্বে। সেদিন রসময় সেন জাফর আহমদ-এর কাছে গিয়ে বিপ্লবী শপথ নিয়েছিল।

রসময়বাবুর গাঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে সেদিন অনাদি অভিভূত হয়ে পড়েছিল, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে। গাছ গুলোয় লাগছিল ঝির্‌ঝিরে বাতাস। মাঠের মধ্যে ছিল ঘন কালো অন্ধকার, আর দূরে দেখা যাচ্ছিল আলো—ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় ঘূর্ণায়মান আলোকস্তম্ভ। অনেকক্ষণ তারা চুপচাপ বসেছিল। অনাদি ভাবছিল, চাকরীটা ফিরে পেলে কেমন করে গড়ে তুলবে তার ভবিষ্যৎকে। আর রসময়বাবু ভাবছিলেন, বাঙলার ভবিষ্যৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ, সারা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ রসময়বাবু অনাদির একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠেছিলেন, 'এ সমাজব্যবস্থাকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে, নতুন করে সমাজ যদি গড়তে না পারি অনাদিবাবু, তাহলে আমাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শুধু বাঁচার তাগিদে, মানুষের মত বাঁচার আগ্রহকে সফল করে তুলতে আমি কমিউনিষ্ট হয়েছি। জানি, অনেক লড়াই, অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের প্রয়োজন আছে। আসুন অনাদিবাবু, কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এসে দুনিয়াজোড়া শোষিত মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানবতার মুক্তির জন্যে লড়াই করি—"

ব্যথিয়ে ওঠে অনাদির মন। রসময়বাবুর অনুরোধ সে রক্ষা করেনি বলে নয়—রসময়বাবুর জন্যে। এমন একজন লোককে পেলে এই পুলিশেরা বোধহয় নখে করে ছিঁড়ে ফেলবে। ক্ষিতিশবাবুর মুখখানা কেমন হয়ে উঠবে ভাবতে গিয়ে অনাদি থমকে যায়। গায়ে ফুঁ দিয়ে ড্রইংরুমে পায়চারী করার মত হাতদুটো লটপট করতে করতে ক্ষিতিশবাবু এসে ঢুকলেন ঘরে। একটা চেয়ার টেনে অনাদির পাশে

বসে বললেন, "আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো অনাদিবাবু? আর একটু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

সে কথা অনেকক্ষণই বুঝে নিয়েছে অনাদি। এই বাড়ীটীতে পদার্পণ করে এদের গদাইনস্করি চালে চলাফেরা করতে দেখেই সে বুঝেছে, অফিস যাওয়ার দফা আজ তার শেষ! দুর্ভাবনাটা এসে ঠেকেছে, ভালয় ভালয় এখান থেকে বেরোতে পারলে হয়। মুখ বুজে মেনে নিতে চেয়েছে এদের কায়দাকানুন। ভেবেছে, ঘাঁটিয়ে লাভ নেই এদের। তবুও মাঝেমাঝে বিরক্তি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে এদের ন্যাকামী দেখে। দুটো কড়া কথা বলার জন্যে জিভ্‌টা তার সুড়সুড় করে উঠেছে। বিরক্তি লুকোবার জন্যে একটু বেশী মাত্রায় আত্মিয়তা করে বসল, "নাঃ, অসুবিধে আর কি! ততক্ষণে না হয় আমার জন্যে এক কাপ চা আনিয়ে দিন, পয়সা আমি দিচ্ছি—"পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দেয় অনাদি।

চোখদুটো গোলাকার করে তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠেন ক্ষিতিশবাবু, "চা খাবেন? এ আর এমন বেশী কথা কি! পয়সা আপনি দেবেন! আরে ছিঃ ছিঃ—" হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যান। ক্ষণেকের জন্যে বাইরে ঘুরে এসে হাত কচলে বললেন, "আর যদি পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করেন। গাড়ী এসে গেল বলে। আমি ফোন করে দিয়েছি, ব্রেকফাষ্ট আপনার জন্যে রেডি থাকবে।"

আবার এক নতুন বিস্ময়, গলার স্বর ভেঙে পড়ে অনাদির, "কোথায় রেডি থাকবে! আবার কোথায় যেতে হবে?"

চেয়ারের ওপর বসে পড়ে অনাদির সামনে ঝুঁকে পড়েন ক্ষিতিশবাবু, "এবার আর আপনাকে হেঁটে যেতে হবেনা অনাদিবাবু। সময় আর কতটুকুই বা লাগবে, সরঞ্জাম তো সবই সেখানে রেডি—কেবল স্টেট্‌-মেণ্টটা লিখিয়ে দিয়েই আপনার ছুটী। আর তেমন যদি দেরী হয়ে

যায়, গাড়ী করে আপনাকে পৌঁছে দেব। বুঝলেন না, সে সব দিন কাল আর নেই! পুলিশ এখন রীতিমত পাবলিক্ সার্ভেণ্ট।"

বিরক্তি দমন করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনাদির স্বরটা তিক্ত হয়ে ওঠে, "সে তো আপনাদের সৌজন্য দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু যেতে হবে কোথায়?"

ক্ষিতিশবাবু সোজা হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, "হেঁ হেঁ, আপনার স্টেটমেণ্টতো আর এখানে লেখা হবে না। আপনি তো আর সাধারণ কয়েদী ন'ন—আপনি হচ্ছেন পলিটিক্যাল্ প্রিজ্‌নার্—"

মুহূর্তে অনাদির হাতদুটো মুঠো হয়ে যায়, দুহাতে বেঞ্চটাকে চেপে ধরে। মাথাটাও যেন ঘুরছে, চোখের ওপর ঘনিয়ে উঠছে অন্ধকার। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে, এমনি করতে করতে বুঝিবা জেলের গেটে দেবে ঢুকিয়ে! সে অধিকারও কি সিকিউরিটী এ্যাক্টে এদের দেওয়া হয়েছে! অনাদির স্বরে বিস্ময় ফুটে ওঠে, "তাহলে প্রিজ্‌নার্ আমি হয়ে গেছি?"

"না, ঠিক প্রিজ্‌নার্ এখনও হননি, উপস্থিত আছেন পুলিশ হেফাজতে—" নির্বিকারভাবে বুঝিয়ে দেন ক্ষিতিশবাবু।

"কিন্তু, কেন? আমার দোষটা কি?" এ প্রশ্ন না করে অনাদি পারেনা।

ক্ষিতিশবাবুরও বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে অনাদির একের পর এক অবান্তর প্রশ্নে। বলেন যেন ব্যাজার হয়ে, "এস্, বি, অফিসে গেলেই জানতে পারবেন। আমরা কি মশাই অতশত জানি! আমরা হচ্ছি হুকুমের চাকর, যেমন যেমন হুকুম—তেমন তেমন কাজ।"

আট

চৌরঙ্গি দিয়ে জিপ্ গাড়ীখানা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। সকাল তখন বোধহয় সাতটা। রাস্তায় তখনও কর্পোরেশনের লোকেরা ছড়ছড় করে জল দিচ্ছে, আর সেই জলে ধাঙ্গড়েরা দু'হাতে ঝাড়ু নিয়ে চৌরঙ্গিকে ঘষে মেজে সাফ করছে। অনাদির মনে হয়, কই তাদের বাড়ীর রাস্তাটাও তো পিচ্ ঢালা, কিন্তু কোনদিনতো ধুতে দেখেনি! ধোয়া তো দূরের কথা, ঝাঁটাই পড়ে না অর্ধেকদিন! চৌরঙ্গি আর মদন পাল লেন, এদের মধ্যে পার্থক্য আজও তাহলে তেমনই রয়ে গেছে!

পূব আকাশে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠেছে। কিন্তু চৌরঙ্গিতে এসে রোদ পড়ার মত ফাঁক বড় অল্প। সূর্যের আলো যেন ঢাকা পড়ে গেছে রহস্যময় ওই বাড়ীগুলোর অন্তরালে। চিরছায়াচ্ছন্ন চৌরঙ্গি কলকাতার চিররহস্যময় অঞ্চল।

হু-হু শব্দে গাড়ীখানা রাস্তার গঙ্গাজল ছিটিয়ে ছুটে চলেছে। কোন এক বেচারী প্রাতঃভ্রমনকারী বোধহয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন্‌স্ থেকে ফিরছিলেন স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, চাকার তলার ঘোলা জলে তাঁর সর্বাঙ্গ গেল ভরে। আঁতকে উঠে ভদ্রলোক এক পা পিছিয়ে গিয়েও রক্ষা পেলেন না। সে কি জলন্ত দৃষ্টিতে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইলেন গাড়ীখানার দিকে! সত্যযুগ হলে গাড়ীর চালক থেকে আরোহি, এমন কি ইস্পাতের গাড়ীখানা পর্যন্ত নিশ্চয়ই ভস্ম হয়ে যেত। কিন্তু কলিকাল কিনা, তাই ড্রাইভার থেকে আরোহি সকলেই উঠল হো হো করে হেসে, যেন কি ভীষণ মজার ব্যাপার!

অনাদি হাসতে পারেনি। অন্যদিন অন্য অবস্থায় সে এমন ব্যাপারে কি করত, তা আজ ভেবে ঠাহর করতে পারেনা। আজকে সে গাড়ীশুদ্ধ

লোকের হাসির মধ্যেও গোমড়া মুখে বসে রইল। তার মনে হল, তার জীবনের পথে কাঁটা ছড়িয়েও তো এরা এমনিভাবে হাসছে।

ফাঁকা রাস্তা। গাড়ীটা ফুল্ স্পীডেই মোড় ঘুরল, খানিকটা গিয়ে আবার মোড় ঘুরল, তারপর আবার, তারপরই এক গেট। কলকাতা শহরে চৌরঙ্গির পাশে এমন বাড়ী যে থাকতে পারে, সে কথা অনাদির কল্পনাতেও আসে নি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ। গাড়ীটা দাঁড়াতেই সে এক সেলাম ঠুকে কায়দা মাফিক ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে, কদম মিলিয়ে পা ফেলে, এগিয়ে পেছিয়ে গেটটা দিল খুলে। ঘ্যাচ্ করে এক হেঁচকায় গাড়ীটা ঢুকে পড়ল গেটের মধ্যে, প্রচণ্ড এক পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিরাট এক শিরিষ গাছের তলায়।

ক্ষিতিশবাবু লাফিয়ে পড়লেন তড়াক করে। অনাদির পাশে বসা পুলিশটাও পড়ল লাফিয়ে। খাতাপত্তর ড্রাইভারের পাশের সীট্ থেকে তুলে নিয়ে ক্ষিতিশবাবু হাঁটতে সুরু করে পেছন না ফিরেই বললেন, "আসামীকো লে যাও—"

কথাটা খট্ করে বেজে ওঠে অনাদির কানে। থানা থেকে এখানে আসার মধ্যেই তার পদোন্নতি হয়ে গেছে! 'বাবু' থেকে সে এখন 'আসামী'!

পুলিশটা বললে, "আইয়ে—" এরা সব অল্প কথার লোক, নিরবে কেবল কাজ করে যায়।

যথাসম্ভব ধীরে সুস্থে অনাদি নামতে লাগল। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, কলকাতায় আসার পর অনাদি এই প্রথম মোটর গাড়ী চড়ল! সে হিসেবে জড়সড় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষিতিশবাবু বা পুলিশটার মত স্মার্টনেস্ দেখানর কোন প্রয়োজনও তো তার নেই। জবুথবু হয়ে নামতে গিয়ে কাপড়ে লাগল খোঁচা, খানিকটা ছিঁড়েও গেল। রাগে সমস্ত শরীরটা তার রীরী করে ওঠে, ইচ্ছে করে সামনের

ওই নির্বিকার পুলিশটার ওপর পড়ে ঝাঁপিয়ে। ওদের জন্যেই তো ছিঁড়ল কাপড়টা। অনাদির যেন কান্না পায়, কেন ওরা শুধু শুধু তাকে এমন নাজেহাল্ করছে! কি এমন ওদের পাকা ধানে সে মই দিয়েছে!

সন্তর্পণে কাপড়ের ছেঁড়া জায়গাটাকে ধরে অনাদি পুলিশটার পেছন পেছন চলতে সুরু করে। ডাইনে বেঁকে সামনেই একটা লম্বা ঘর, বড়লোকের বাড়ীর দরোয়ানের ঘরের মত। দরজার ওপর লেখা 'রিসেপ্‌সন্ রুম্'। ভেতরে লম্বা ঘরজোড়া একখানা টেবল আর তার চার পাশে বেঞ্চ।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অনাদির গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। অন্ধকারে ঘরটা যেন ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে! ড্যাম্প আর পুরণো ধুলোর গন্ধে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। দরজার মুখোমুখি বেঞ্চটায় বসে পড়ে অনাদি। এতক্ষণে সত্যিই যেন ভয় ভয় করছে তার। অদ্ভুত ধরণের ভয়, কতকটা ছেলে বেলার ভূতের ভয়ের মত। সে রকম কোন দুষ্টামি করলে মা তাকে পাঠিয়ে দিতেন দেউড়ির পাশের ঘরটায়। ইঁটগুলো দাঁত বার করা, মেঝে থেকে উঠছে সোঁদা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আর মাথার ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে চাম্‌চিকে! ভয়ে আঁতকে উঠে সে বাড়ীর ঝি লক্ষ্মী কাওরাণীর কাপড়ের মধ্যে মুখ চেপে ধরত। একবার ওঘর ঘুরে এলে কিছুদিনের জন্যে মা নিশ্চিন্ত হতেন!

ত্রস্তে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে অনাদি। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের মধ্যেকার ফ্যাকাশে অন্ধকার সহে যায় চোখে। স্বস্তি বোধ করে দেখে, সে ছাড়া আরও কয়েকজন লোক আছে ওই ঘরের মধ্যেই। যাক্, তাহলে এটা 'ডার্ক সেল্' নয়! ঘরের শেষপ্রান্তে খাকি কোর্তা পরা জন তিনেক সিপাই নিচু গলায় বিশেষ কোন এক বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। আর তার বাঁদিকের বেঞ্চে এক যুবক, সাধারণ পোষাকে।

এতক্ষণে অনাদি গুছিয়ে বসে বেঞ্চটার ওপর, পিঠটা এলিয়ে দিয়ে ডান হাতটা মেলে দেয় বেঞ্চের পেছনে হেলান দেওয়ার কাঠটায়। আর এতক্ষণে সে যেন সহজ হয়ে তার পরিবেশটাকে লক্ষ্য করতে থাকে। আরও একজন মানুষ তারই মতন সাধারণ পোষাকে রয়েছে, এটা যেন তাকে খানিকটা খুশীর জোগান দেয়। আর তার প্রহরী সেই পুলিশটী বসেছে দরজার পাশে রোয়াকের ওপর একটা টুলে, খৈনি বানানর কাজে সে ইতিমধ্যেই লেগে গেছে।

খাকি পোষাক পরা সিপাইদের কথাবার্তা তখনও সেই একই ভাবে চলেছে। বাঁদিকের বেঞ্চে বসা যুবকটী তখনও তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে, কি যেন সে খুঁজছে তার মুখের মধ্যে! চোখাচোখি হতেই চট্ করে অনাদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেমন যেন তার মনে হয়, লোকটী হয়তো একজন ইন্‌ফর্‌মার্‌!

সিপাইদের দিকে তাকিয়ে থাকে অনাদি। তখনও তারা সেই একই আলোচনায় মস্‌গুল। কান খাড়া করে অনাদি শোনবার চেষ্টা করে। সিপাইদের মধ্যে যেটী বয়স্থ, সে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের তালিম্‌ দিচ্ছে নয়া জমানার হাল্‌চাল্‌ সম্বন্ধে, "হাঁ, গুপ্তবাবু আদমীতো বহৎ আচ্ছা হ্যায়, মগর্‌, বেগার্‌ পয়সাসে কোই কাম্‌ উন্‌সে কভ্‌ভি নহি মিল্‌তা। হামারা ছুটিতো মঞ্জুর হো গয়া, লেকিন ফাইল্‌ তো হ্যায় উন্‌কা হাথমে। থোড়া-কুছ্‌ নহি দেনেসে ও ফাইল ঔর ভি এক হপ্তা উন্‌কা টেবুল পর পড়া রহেগা—"

ওদের মধ্যে বয়সে যেটী ছোট, সে হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, "এয়সা কেঁও! ইয়ে তো বহৎ জুলুম্‌ কা বাত! উনকা তো কাম্‌ই হ্যায় ছুটিকা ফাইল ভেজ্‌ দেনা—তব্‌ কেঁও এয়সা গরীবকা খুন চুষেগা?"

বয়োজ্যেষ্ঠ হাসে মুচকে মুচকে, "এহি হ্যায় জমানা। তুম্‌ কেঁও দোকানদার ঔর হকার লোগোঁসে দস্তরি লেতা?"

বয়োকনিষ্ঠের মুখখানা ম্লান হয়ে যায়, ম্রিয়মান স্বরে বলে, "ক্যা করেগা ভাইয়া—তলব্‌সে তো কাম্ নহি উঠতা।"

মুচকে হেসে সাধারণ পোষাকে সেই যুবকটী সোৎসাহ দৃষ্টি মেলে অনাদির দিকে ফিরে বলে ওঠে, "দেখলেন তো, দুনিয়ার সর্বত্র এই একই হাল, কারুরই আর মাইনেতে কুলোচ্ছে না। আমরা চালাই নিজেদের পেট কেটে, আর ওরা রাজপুরুষ কিনা, তাই চালায় অপরের গলা কেটে। কিন্তু মানুষের মত জীবন কারও কাটছে না।"

বিস্ময়ে অনাদি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিছু যেন সে একটা বলতে যায়। কিন্তু অনুশোচনায় গলাটা তার বুজে আসে। এই লোকটীকে কিনা সে ইন্‌ফর্‌মার্ মনে করেছিল! কিন্তু এখন তার কোনই কষ্ট হচ্ছে না বুঝতে যে, এ-ও রসময়বাবুর জাতের লোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, রসময়বাবুর জাতের লোকই বটে, সেই 'আমরা' আর 'ওরা'! 'আমরা' অর্থে যারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বঞ্চিত আর নির্যাতিত মানুষ। আর 'ওরা'—যারা এই মানুষগুলোকে বঞ্চণা করছে, নির্যাতন করছে।

ক্ষমা চাওয়ার সুরে কি যেন বলতে যায় অনাদি, কিন্তু তখনই বাইরে থেকে এল তার নাম ধরে হাঁক, "অনাদিবাবু কিস্‌কো নাম ?"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় অনাদি, চোখ দুটো তার তখনও যুবকটীর হাড়সার মুখের মাঝখানে জলজ্বলে চোখ দুটোর ওপর। যুবকটী বললে, "যান, ঘুরে আসুন। আমিও আছি এখনো কিছুক্ষণ—"

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনাদি। বিরাট গোঁফওয়ালা এক সিপাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "আইয়ে হামারা সাথ্—"

সিপাইটীর পাশে এসে অনাদি সভয়ে জিজ্ঞেস করে, "কোথায়—আবার কোথায় যেতে হবে ?"

কড়া মেজাজে সিপাইটী বলে ওঠে, "জলদি চলিয়ে—" কৈফিয়ৎ দেওয়ার রীতি এ দুনিয়াটায় নেই।

অনাদির মেজাজটাও বেঁকে ওঠে, মোচড় দিয়ে বলে, "তোমার কথায় তো দেখছি বাপু এখনও পুরণো আমলের ঝাঁঝ! তুমি বুঝি এখনও মিছরির ছুরি হয়ে উঠতে পারনি?"

এমন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা সিপাইটী বোধহয় বুঝতে পারে না। ভ্রু কুঁচকে তেড়ে ওঠে, "ক্যা?"

আপন মনেই অনাদি বিড়বিড় করে বকে যায়, "নাঃ, তেমন কিছু নয়। শুনলাম, তোমরা পাবলিক সার্ভেণ্ট হয়েছ—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে সিপাইটী অনাদির মুখখানা, স্বরটা তার কোমল হয়ে আসে। বোধহয় সে ভেবেছিল, ভয় পেয়ে অনাদি ভুল বকছে। আশ্বাসদানের সুরে বললে, "ডরো মৎ বাবু—কম্যুনিষ্ট-লোক কভ্‌ভি ঘাবড়াতা নহি—"

অনাদির বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এও জানে, কমিউনিষ্টরা ঘাবড়ায় না। তা ও-তো জানবেই। সিকিউরিটী এ্যাক্টের দৌলতে রোজই তো ধরে নিয়ে আসছে কমিউনিষ্টদের। সে কমিউনিষ্ট হোক আর না-ই হোক, এদের সন্দেহ হলেই হল! একটা ঘটনা নতুন এক চেহারা নিয়ে অনাদির মনে পড়ে। ঘটনাটা বলেছিলেন নয়নবাবু, তার অফিসের সহকর্মি। তাঁদের পাড়ায় কোন এক বড়লোকের বৃহৎ এক মোটর চাপা দিয়েছিল ছোট একটী ছেলেকে। গাড়ী নিয়ে ড্রাইভার পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাড়ার লোকে ঘিরে ফেলে গাড়ীটাকে, নিয়ে যায় সেটাকে থানায়। থানার ও, সি, তখনই ফোন করে জানালেন গাড়ীর মালিককে। গাড়ীর মালিক এলেন আরও একখানা গাড়ী চড়ে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলেন থানার ও, সি, গাড়ীর মালিকের সঙ্গে। ফিরে এসে ও, সি, রায় দিলেন, ছোট ছেলেটারই দোষ—সে-ই দৌড়ে এসে গাড়ীটাকে ধাক্কা মারে। সুতরাং যে যার

পথ দেখ—ভীড় হঠাও। পাড়ার একটী ছেলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। থানার ও, সি, তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'বেশী যদি বাড়া-বাড়ি কর, তাহলে কমিউনিষ্ট বলে এখনই সিকিউরিটী এ্যাক্টে চালান করে দেব।' মুখের কথা মুখে রয়ে গেল ছেলেটীর, পাড়ার লোকেরা সুড়সুড় করে কেটে পড়ল। নয়নবাবু মন্তব্য করেছিলেন, 'কি কলই বানিয়েছে সরকার এই সিকিউরিটী এ্যাক্ট!'

নয়নবাবুর পাড়ার সেই ছেলেটী ভয় পেয়ে চলে এসেছিল, কিন্তু কেষ্টবাবু ডজনখানেক লাঠি, রাইফেল, রিভলভারধারী পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও ঘাবড়াননি! ভয় পাননি ওই তালপাতার সেপাই কেষ্টবাবু সাজোয়া পুলিশবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে তাঁর বক্তব্য চিৎকার করে বলে যেতে!

বিস্ময় লাগে অনাদির, এই সিপাইটীর মুখ থেকে এই কথাটা যদি ক্ষিতিশবাবু শোনেন, তাহলে কি হতে পারে, সেই কথা ভেবে! সিপাইটীর চাকরী তো যাবেই! হয়তো একেও ওরা কমিউনিষ্ট বানিয়ে দেবে!

অনাদির গতি কখন যেন মন্থর হয়ে গেছে—সিপাইটী গেছে খানিকটা এগিয়ে। রিসেপ্‌শন্ রুম্ থেকে বেরিয়ে খানিকটা মাঠ, পার হয়ে একটা দোতলা বাড়ী। মাঠের ওপর দিয়ে কোণাকুণি একটা পায়ে চলার পথ। অনাদি বুঝতে পারে ওই বাড়ীটার মধ্যেই সে চলেছে। আশেপাশে চারদিকে তাকিয়ে দেখে, নির্জনতায় সমস্ত প্রাঙ্গণটা খাঁ খাঁ করছে। বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে সবুজ ঘাসের ওপর। পুরণো আমলের বাড়ীটা রয়েছে দাঁড়িয়ে সেই গাছের মালার মাঝখানে।

ভাল লাগার একটা ভাব ঘনিয়ে উঠছে অনাদির মনে। বাড়ীটা দেখেই তার মনে পড়ে গেছে দেশের কথা। গ্রামের জমিদার রায়েদের বাড়ীর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। কিন্তু রায়েদের

বাড়ীটাকে গ্রামের লোকে বলে 'খুনে বাড়ী'। ও বাড়ীর পড়ো অংশটাকে খুঁড়তে গিয়ে নাকি বেরিয়েছিল অনেকগুলো কঙ্কাল। আর সেই কঙ্কাল দেখে অনেকদিনের পুরণো চাপা পড়া কাহিনী আবার উঠেছিল জেগে। সে কাহিনী দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার জনার্দন রায়ের দাপটের কাহিনী। গ্রামের বৃদ্ধেরা আজও নাম করে করে বলে, কার কার কঙ্কাল ওগুলো। পাঁচু মোড়ল কৃষকদের নিয়ে জোট পাকিয়ে খাজনা মকুবের আর্জি পেশ করেছিল। জনার্দন রায় বলেছিলেন, 'জমিদার দান করে কিন্তু খাজনা মকুব করেনা।' খাজনা মকুব হয়নি, জনার্দনের পেয়াদা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করে এনেছিল থালা, কাঁসি, কৃষকবৌয়ের গলা থেকে রূপোর হাঁসুলি, পায়ের মল, যা তারা পেয়েছিল। পাঁচু বরদাস্ত করতে পারেনি এতখানি। সড়কি আর বল্লম চালিয়ে সাবাড় করেছিল তিনটে পেয়াদাকে। তিনদিন পরে পাঁচু মোড়লকে সপরিবারে আর দেখতে পাওয়া যায়নি।

অনাদির গায়ের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। নিজেরই তার রাগ হয় নিজের ওপর। কেনইবা তার মাথায় এমন আজগুবি চিন্তাগুলো যে আসছে! আবার সে সরল মনে ভাববার চেষ্টা করে, এইতো তার ডাক পড়েছে, এইবার তার স্টেটমেণ্ট নেওয়া হবে। বড়জোর আধঘণ্টা কি পৌনে একঘণ্টা। তার মানে ন'টার মধ্যে সে ছুটী পেয়ে যাচ্ছে। বাড়ী পৌছতে আর আধঘণ্টা, তার মানে সাড়ে ন'টা। নাঃ খাওয়াটা আজ আর হল না—এখান থেকে সোজা অফিস রওনা হয়ে পড়বে।

বাড়ীটার সামনে খানিকটা জায়গা জুড়ে সাদা সাদা নুড়ি বিছান। জুতোশুদ্ধ পা বাড়াতেই কেমন খড়খড় করে ওঠে, পায়ের ধাপটা যায় নড়বড়ে হয়ে। ওইটুকু পার হলেই সাবেক কালের মস্ত এক দরজা। সিপাইটী উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার পৈঠায়। কিন্তু অনাদির পা

যেন আর চলে না, হাঁটুদুটো রীতিমত কাঁপছে। গ্রামের লোক আজও জনার্দন রায়ের বাড়ীর ত্রিসীমানা দিয়ে যায় না। কে নাকি কবে গিয়ে অনেকগুলো মানুষের আর্তনাদ শুনেছিল, 'মরে গেলুম—মরে গেলুম!'

নয়

এখানেও অন্ধকারের রাজত্ব! পথপ্রদর্শক সিপাইটীর পেছন পেছন চলেছে অনাদি আদ্যিকালের পুরণো বাড়ীটার ঘরের পর ঘর পার হয়ে। যে ঘরটার মধ্যে সিপাইটী দাঁড়িয়ে পড়ল, সে ঘরটায় দিনের বেলাতেও ঘুটঘুটে অন্ধকার—আলোর যেটুকু রেশ ধরে ওরা এতক্ষণ এগিয়ে এসেছে, তার যেন পরিসমাপ্তি ঘটেছে এই ঘরটার মধ্যে এসে। মুহূর্তে অনাদির মনটা আঁতকে ওঠে, এই কি ডার্ক সেল্!

চকিতে অনাদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় প্রবেশ পথের দরজাটার দিকে, ওদিকটায় তবু যেন একটু আলোর আভাষ পাওয়া যায়। অতি মোলায়েম স্বরে একটা ডাক এল, "আসুন অনাদিবাবু, এই যে এখানে—"

স্বর লক্ষ্য করে আবার অনাদি ঘুরে দাঁড়ায়। ঘরের অন্ধকার কিছুটা চোখে সহে গেছে—দেখা যাচ্ছে ঘরের আসবাবপত্র আবছায়ার মত। চোখ কুঁচকে অনাদি দেখলে, ঘরের এককোণে টেবলে এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, কেবল তাঁর জামা কাপড়টাই দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে টেবলের ধার ঘেঁষে অনাদি দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, "আহা-হা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! বসুন। সে সব দিনকাল কি আর আছে মশাই! এখন তো আপনাদেরই রাজার খাতির—"

পাশ থেকে একখানা চেয়ার সশব্দে টেনে নিয়ে বসে পড়ল অনাদি। বুঝল, এটাও ক্ষিতিশবাবুর জাতভাই—এর সামনে সহজ আর স্বাভাবিক হয়েই থাকা দরকার। পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালে, দেশলাই কাঠিটা না নিভিয়ে জ্বলতে দিলে শেষ পর্যন্ত, সেই ফাঁকে অনাদি দেখে নিলে তার সামনের অমায়িক জীবটার মুখখানা। দেশলাই কাঠিটা নিভে যেতেই ভদ্রলোক টেবলের ড্রয়ার খুলে বার করলেন একটা রিভলভার। চেম্বার পরীক্ষা করার জন্যে তুলে ধরলেন চোখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁকলেন, "দরোয়াজা, বাতি জ্বালাও—"

দরজার গোড়ায় বসে থাকা সিপাইটা কোথায় যেন সুইচ্ টিপে দিলে। ভদ্রলোকের ঠিক মাথার ওপর পঁচিশ ওয়াটের একটা আলো জ্বলে উঠল। ধূলো পড়া বাল্বটার লালচে আলোয় অনাদি দেখলে, ঘরটা বেশ বড়ই আর টেবলও রয়েছে আরও খানকয়েক, ঘরটার চার দেয়ালে রয়েছে কড়িকাঠ পর্যন্ত লম্বা লম্বা ষ্টীলের র‍্যাক্, তাতে থরে থরে ফাইল্ সাজান। হঠাৎ অনাদির মনে হয়, এই ফাইলগুলোই তো জনার্দন রায়ের বাড়ীর সেই কঙ্কাল! ওতে তো আছে গুলি করে মারা, ফাঁসিতে ঝোলান আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সমস্ত রেকর্ড!

কেমন যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনাদি ভদ্রলোকের মুখের দিকে চায়। রিভলভারের চেম্বার পরীক্ষা শেষ করে ডান হাতের ড্রয়ারটার মধ্যে রাখতে রাখতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ব্রেকফাষ্ট হয়েছে?"

ঝপ্ করে অনাদি চটে যায়, স্বরে তার বিরক্তির ঝাঁঝ ফুটে ওঠে, "তার আর দরকার হবে না, আপনি আপনার কাজ সুরু করুন। আমাকে আবার অফিস যেতে হবে—"

ভদ্রলোক বিস্ময়ে কুঁচকে ওঠেন, "রাগ করার আপনার ষোলআনা অধিকার আছে। ক্ষিতিশবাবু যখন সার্চ রিপোর্টটা তৈরী করলেন,

তখন স্টেটমেণ্টটাও তিনি অনায়াসেই নিতে পারতেন, আর আপনারও ছুটী হয়ে যেত সেই কোন কালে! দেখুন না, আমারও কি ছাই কম দুর্ভোগ! যাক্, যেতে দিন মশাই ওসব কথা। জানেন অনাদিবাবু, মনেপ্রাণে আমরাও কমিউনিষ্ট—মুখ ফুটে শুধু বলতে পারিনা চাকরী যাওয়ার ভয়ে। যাক্, ব্রেকফাষ্ট তাহলে এখনও আপনাকে দেয়নি?"

এত বিরক্তির মাঝেও হাসি পায় অনাদির, "বললাম তো; তার কোন দরকার নেই। কাজটা আপনি তাড়াতাড়ি সেরে নিন, তাহলে আমিও নিষ্কৃতি পাই—"

"তা বটে, কিন্তু কথাটা কি জানেন? এতক্ষণ না খেয়ে থাকবেন! আর আমাদের কি মশাই কম জ্বালা! একথা যদি ওপরওয়ালাদের কানে যায়, তাহলে কি আর চাকরী থাকবে মনে করেছেন! আপনারা হয়েছেন শাঁখের করাত! আপনাদের বাইরে রেখেও শান্তি নেই, আবার জেলে পুরেও স্বস্তি নেই! এই দেখুন না, সিকিউরিটী প্রিজনাররা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ করবে বলে শাসাচ্ছে। আর আপনারা তো বাইরে তাই নিয়ে তুমুল কাণ্ড সুরু করে দিয়েছেন।"

তাজ্জব ব'নে যায় অনাদি, কত রকমের লোকই না আছে এদের মধ্যে। অবনীবাবু গেল, ক্ষিতিশবাবু গেল, এবার এটীর প্যান্‌প্যানানি শুনতে শুনতেই যে বেলা ফুরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! কিন্তু বারবার ও 'আপনারা' 'আপনারা' করছে কেন? তার মানে ছাগলকে কুকুর বলতে বলতে কুকুর বানিয়ে দিতে চায়! স্পষ্ট করে অনাদি বলতে যায়, 'না, আমি কমিউনিষ্ট নই—' কিন্তু মুখ খোলার আগেই ভদ্র-লোক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন, "দাঁড়ান একটু—" তারপর বিরক্তিতে ফেটে পড়ে হেঁকে উঠলেন, "দরোয়াজা, জল্‌দি হেমবাবুকো বোলাও—"

ভদ্রলোকের বিরক্তি যেন তাতেও মিটতে চায় না। আপন মনেই

গজ্‌গজ্‌ করে ওঠেন, "এরা মনে করেছে কি! মানুষকে মানুষ মনে করে না!" অনাদির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনিই বলুন, মানবতা বলে তো একটা জিনিষ আছে! গভ্‌মেণ্টের আইন, কানুন, ব্যবস্থা, সবই রয়েছে—শুধু সেই অনুযায়ী কাজ করা। আপনারা মনে করবেন, সিকিউরিটী প্রিজনারদের গভর্ণমেণ্ট বুঝি এমনই উপোষ করিয়ে রাখে!"

ভদ্রলোকের ওই 'আপনারা'কে সামলাবার জন্যে আবার অনাদি তার নিজের কথাটা বলে রাখতে যায়। কিন্তু এসে পড়লেন হেমবাবু, হন্তদন্ত হয়ে বললেন, "আমাকে ডাকছেন খগেনদা?"

আর যাবি কোথায়! খগেনবাবু একেবারে বোমার মত ফেটে পড়লেন, "আপনার কি মশাই চাকরীবাকরী করবার ইচ্ছে নেই নাকি? রাত চারটের সময় ভদ্রলোককে বিছানা থেকে তুলে এনে সাতঘাটের জল খাওয়াচ্ছেন, তা এঁর ব্রেকফাষ্টের বন্দোবস্তটাও তো করবেন! বাইরে গিয়ে ইনি যদি কাগজে একটা স্টেটমেণ্ট দিয়ে দেন, তখন সামলাবেন কি করে? আর জানেনই তো, কাগজওয়ালাদের আমাদের ওপর নেক্ নজর কত!"

হাত কচলে হেমবাবু বললেন, "আমি তো অনেকক্ষণ ব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আর শুধুতো এঁর একার জন্যে নয়, আরও একজন আছে রিসেপ্‌শন্ রুমে। নাঃ, এই কেষ্টা ছোঁড়াটা বড় জ্বালালে দেখছি—" হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যান হেমবাবু, খানিক দূরে গিয়েই রীতিমত হাঁকডাক, চেঁচামেচি সুরু করে দেন।

খগেনবাবু তখনও চুপচাপ বসে মুচকে মুচকে হাসছেন। সে হাসির অর্থ অনাদি সঠিক বুঝতে পারেনা, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে খগেনবাবুর মুখের দিকে। ঘরটা কেমন যেন থম্‌থম্ করছে, পুরণো বাড়ীর দেয়ালের ফাটলে ফাটলে আর ফাইলের গাদার খাঁজে খাঁজে

অশ্রান্ত ডেকে চলেছে ঝিঁঝিঁপোকা। ধীরে ধীরে অনাদি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

বাচ্চা একটা ছেলে খালি গায়ে, হাফ্‌প্যান্ট পরে, হিন্দী গানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এসে ঢুকল ঘরে। একেবারে অনাদির পাশে এসে কাগজের একটা মোড়ক তার হাতে দিয়ে, টেবিলের ওপর ঠক্ করে বসিয়ে দিলে আঙটা-ভাঙা, চটা-ওঠা একটা কাপ—তাতে ঢেলে দিলে শেষ তলানি পর্যন্ত খানিকটা গুড়ের চা।

কাগজের মোড়কটা খুলে এক স্লাইস্ মাখন-রুটী বার করে অনাদি হঠাৎ হেসে উঠল হোঃ হোঃ করে।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে খগেনবাবু বললেন, "হাসছেন যে ?"

"এই বুঝি আপনাদের ব্রেক-ফাষ্ট !"

"হ্যাঁ, এই হল এখানকার বরাদ্দ।"

আবার হাসি উছলে ওঠে অনাদির মুখে, "আমিতো ভেবেছিলাম ফার্‌পো কিম্বা গ্র্যাণ্ড থেকে বুঝি আসছে।"

সকৌতুকে চোখের তারা নেচে ওঠে খগেনবাবুর, "তাই নাকি !"

অনাদি সেই হাল্কা সুরেই বলে যায়, "তাহলে আর সিকিউরিটী প্রিজনাররা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করবে না কেন !"

"তাহলে রাজবন্দীদের এই অনশন ধর্মঘটে আপনার সমর্থন আছে ?" ঝট্ করে সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন খগেনবাবু।

থতমত খেয়ে যায় অনাদি, আমতা আমতা করতে থাকে, "ধর্মঘট—অনশন—আমিতো কিছুই জানি না।"

"আপনার নাম ?"

"আমার নাম ! আপনি তো জানেন—"

"আপনি তাহলে বলবেন না ?" খগেনবাবুর স্বরে রীতিমত ভয় দেখানর হুমকি।

স্তিমিত হয়ে আসে অনাদি। এই লোকটারই প্যান্‌প্যানানি শুনে সে বেশ খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছিল, ওটা তাহলে ভদ্রলোকের একটা কৌশল! নাম, ঠিকানা, বাবার নাম, কর্মস্থল, সবই অনাদি বলে যায় খগেনবাবুর একের পর এক প্রশ্নের উত্তরে। খগেনবাবু লিখে চলেছেন খস্‌খস্‌ করে। আধপাতার ওপর লেখা শেষ করে তিনি যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। খাতাটাকে পাশে সরিয়ে রেখে, টেবিলের ওপর কণুইয়ের ভর দিয়ে, হাতের চেটোয় মুখ রেখে বললেন, "তা, এই কমিউনিষ্টদের পাল্লায় পড়লেন কি করে?"

অনাদি সোজাসুজি উত্তর দিলে, "আমি কমিউনিষ্ট নই।"

"আহা-হা, সে কি আর আমি জানি না! কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওদের খপ্পরে পড়লেন কি করে?"

ঝাঁঝাল স্বরে অনাদি উত্তর দেয়, "কারও খপ্পরে আমি কখনও পড়িনি—"

অমায়িক হেসে খগেনবাবু বললেন, "এটা কিন্তু আপনি সত্যি কথা বললেন না।"

"তার মানে!" একেবারে রুখে ওঠে অনাদি, "তার মানে আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছেন?"

ব্যথা পেয়ে খগেনবাবু যেন কাত্‌রে ওঠেন, "আহা-হা, সে কথা কি আমি বললাম! শুধু শুধু আপনি আমার ওপর রাগ করছেন—" খাতাটাকে আবার তিনি টেনে নিলেন সামনে। কলমটা খাতার ওপর নামিয়ে লেখার উদ্যোগ করে বললেন, "যাক্, যেতে দিন ওসব কথা। আমার যা কাজ, আমি সেরে ফেলি—" মুখটা তুলে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য?"

আবার যেন অনাদির হাসি পায়, এ লোকটা গর্দভ না কি! হাল্কা হেসে বললে, "এত কথার পর এ প্রশ্ন করার কি কোন মানে হয়?"

টপ্ করে খগেনবাবু বলেন, "মানে আর কিছুই নয়, কেবল চাকরীটা বজায় রাখা। বুঝলেন না, স্টেটমেণ্ট নেওয়ার একটা ছক আছে, তার মধ্যে এ প্রশ্নটাও একটা।"

হাল্কা ভাবটা অনাদির বজায়ই থেকে যায়, বললে, "না।"

"কোন কমিউনিষ্টের সঙ্গে আপনার পরিচয়, বন্ধুত্ব বা সংশ্রব আছে?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় অনাদি। কার সঙ্গে পরিচয় করবে, বন্ধুত্ব পাতাবে বা সংশ্রব রাখবে, সেটাও কি সিকিউরিটী এ্যাক্টের আওতায় পড়ে নাকি! কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "না।" কিন্তু খগেনবাবু তখনও চোখের কোণে টেরছাভাবে চেয়ে আছেন তার দিকে। বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ করে ওঠে অনাদির। মনে হয়, রসময়বাবু, কেষ্টবাবুর সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে, সে সমস্ত খবরই কি এরা জানে!

ক্ষণেক চেয়ে থেকে খগেনবাবু চোখ নামিয়ে নিয়ে লিখতে স্থরু করে বললেন, "এক কথায় একেবারে 'না' বলে দিলেন! যাক্, আমার অত কথায় দরকার কি মশাই—আমি স্টেটমেণ্ট নিচ্ছি, আপনি যা বলবেন তাই আমি লিখে নেব। তবে কিনা সত্যি কথাটা বললেই ভাল করতেন অনাদিবাবু, কেস্টা আপনার তেমন জটিল নয়।"

হন্তদন্ত হয়ে হেমবাবু ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। একেবারে অনাদির মুখের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি খাবেন?"

প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অনাদি বোকার মত চেয়ে থাকে হেমবাবুর মুখের দিকে। হেমবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন, "কি খাবেন আপনি—ভাত না খাবার?"

বিস্মিত অনাদির মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে পড়ে, "কেন!"

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন হেমবাবু, "কেন কি মশাই! না খেয়ে থাকবেন নাকি? ঝটপট একটা বলে দিন, আমার মশাই দাঁড়াবার সময় নেই।"

অনাদির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, বললে, "খেলাম তো আপনাদের ব্রেকফাষ্ট। এইবার তো বাড়ী ফিরব। স্টেট্‌মেন্ট তো শেষ হয়ে গেছে—"

কিছুটা যেন কুণ্ঠিত স্বরে হেমবাবু বললেন, "কিন্তু আপনাকে তো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ইন্‌টারোগেশন্‌ হবে সেই বেলা একটায়—"

চেয়ারের হাতলটা মুঠো করে চেপে ধরে অনাদি, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে ওঠে তার শরীর। বুজে আসা গলায় জোর করে প্রশ্ন করে, "তার মানে, আপনারা আমাকে ছাড়ছেন্‌ না?"

হাত কচলে হেমবাবু বললেন, "ছাড়ার মালিক তো আমরা নই দাদা।"

অনাদি মরিয়া হয়ে উঠে বলে, "কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন তো ওই একটাই—আমি কমিউনিষ্ট কিনা। তার জবাব আমি সেই ভোর রাত্তির থেকে দিয়ে আসছি। আবার আমি বলছি, আমি কমিউনিষ্ট নই—আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও কমিউনিষ্ট হয়নি। এরপর আর কি আশা করতে পারেন আমার কাছ থেকে?"

"আশা আমরা অনেক কিছু করি মশাই—" হেমবাবুর ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি ফুটে ওঠে, "বুঝলেন না, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমরা কি মশাই ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? কথাটা হচ্ছে, আপনাকে যখন আইনসঙ্গত ভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তখন এখানকার নিয়ম মাফিক চলতে আপনি বাধ্য।"

রক্ত চড়ে যায় অনাদির মাথায়, "তা, সে কথা তো গোড়ায় বললেই

পারতেন। বাড়ীতে গিয়ে যখন চড়াও হলেন, তখনতো একেবারে ভদ্রতার অবতারটী—”

হেমবাবু রুখে এগিয়ে আসেন, “কি অভদ্র ব্যবহারটী অপনার সঙ্গে করা হয়েছে শুনি?”

এতখানি বাক্‌বিতণ্ডার নিরব শ্রোতা খগেনবাবু এতক্ষণে নড়েচড়ে ওঠেন, “আঃ হেমবাবু কি হচ্ছে!”

হেমবাবু ঢোঁক গিলে সামলে নেন নিজেকে। বিগলিত স্বরে খগেনবাবু বলতে থাকেন, “বুঝি, আপনার রাগ হওয়াই উচিত। কিন্তু আমাদের ওপর রাগ করে লাভ কি বলুন! আপনার কথাবার্তায় যতই ঝাঁঝ ফুটবে, ততই আপনার কেস্ খারাপ হবে। জানেন, একমাত্র কমিউনিষ্টরা ছাড়া আর সকলেই এখানে এসে ভয়ে কেঁচোটী হয়ে যায়। আমরা আপনাকে কিছুই করছি না। হোম্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে যেমন যেমন হুকুম আসছে আমরাও তেমন তেমন করছি।”

শান্ত হয়ে যায় অনাদি। তার প্রতিবাদের মূল্য এই চৌহদ্দির মধ্যে যে কতখানি, তা সে এতক্ষণে বুঝতে পারছে। সহজ বিনীত স্বরে সে জিজ্ঞেস করলে, “বেশ তো, আপনাদের হোম্ ডিপার্টমেণ্টের হুকুমটা না হয় শুনিয়ে দিন—তাঁরা কি করতে চান আমাকে নিয়ে।”

হেমবাবু বললেন, “দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খোলা-খুলিই বলি। হোম্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আপনাকে আটক করা বা ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে কোন অর্ডার এখনো এসে পৌঁছয়নি। আশা করা যাচ্ছে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই এসে পড়বে। তার আগে আপনি ছাড়া পাচ্ছেন না। আর আমার পক্ষে বলা উচিত না হলেও আপনাকে বলছি, জেনে রাখুন, সাধারণত সাতদিনের আগে বড় একটা কাকেও ছাড়া হয় না। তবে ইন্‌টারোগেশনে যদি স্যাটিশফ্যাক্টরী উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আজই বাড়ী ফিরতে পারেন।”

"স্যাটিশফ্যাক্টরী মানে!" অলস কণ্ঠে বেরিয়ে আসে এক প্রশ্ন অনাদির মুখ থেকে।

টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খগেনবাবু বলেন, "এই আর কি, যা যা আপনি জানেন অকপটে বলে যাবেন। তাতে কোন ক্ষতিতো আপনার হবেই না, বরং লাভই হতে পারে।"

খগেনবাবুর উৎসুক চক্‌চকে চাহনির সামনে অনাদি ধীরে ধীরে উঠে বসে। এক ঝলক রক্ত তার মুখের ওপর ঠেলে উঠে এসেছে, কি এক অস্বস্তিতে সে ছট্‌ফট্ করছে। খগেনবাবুর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সে বুঝবার চেষ্টা করছে, কি ইঙ্গিত তিনি করতে চাইছেন।

আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে অনুনয়ের স্বরে খগেনবাবু বললেন, "আপনার অফিসে আর পাড়ায় কে কে কমিউনিষ্ট আছে, কি কি কাজ তারা করে, অন্তত তাদের নামগুলো বলুন—এখুনি আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।"

সোজা কাঠ হয়ে বসে আছে অনাদি, শক্ত করে চেয়ারের হাতল দুটো প্রাণপণে চেপে ধরেছে। খগেনবাবুর মুখের ওপর তার আরক্ত চোখ দুটো রেখে হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে, "এ আপনারা কি বলছেন!"

মুচকে হেসে খগেনবাবু বলেন, "যা বলছি, তা করলে আপনার মঙ্গল হবে অনাদিবাবু।"

খগেনবাবুর মুখের ওপর থেকে চোখ দুটো কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে পারছে না অনাদি, ধীরে ধীরে মাথাটা তার ঈষৎ দুলছে, 'হ্যাঁ, এরাই তার ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু...' কি যেন মনে আসছে অথচ মাথায় আসছে না! অনাদি খুঁজছে আঁতিপাতি করে। স্মৃতির গহ্বর থেকে বুদ্‌বুদের মত ভেসে ওঠে একটা নাম—নরেন গোঁসাই। ওই নামটাই

যেন ঘৃণার এক অভিব্যক্তি! ক্ষেপা কুকুরকে যেমন করে গুলি করে মারে, তেমনি করে গুলির পর গুলি চালিয়েছিল ফাঁসির আসামী সত্যেন—মেরে ফেলেছিল নরেন গোঁসাইকে। বড়মামা সেদিন কি খুশী! বাড়ীতে ফিরে হাঁকডাক করে বলেছিলেন, 'দিয়েছে—দিয়েছে শালাকে শেষ করে! না হলে কি সর্বনাশটাই হত ভাবতো! কতগুলো ছেলেকে যে ফাঁসিতে চড়াত কে জানে!'

ঘৃণায় অনাদির সমস্ত শরীরটা যেন কুঁকড়ে ওঠে। ওদের ওই প্রস্তাব যেন তার মুখের ওপর এক পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে। ইচ্ছে করছে, খগেনবাবুর মুখের ওপর খানিকটা থুথু ছিটিয়ে দেয়। মুখখানা তার দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে ওঠে। চোখ দুটো কুঁচকে সূচের মত চাহনি দিয়ে খগেনবাবুর মুখখানাকে বিদ্ধ করে ধীরে অতি ধীরে বলে অনাদি, "আর কি কি প্রশ্ন আছে আপনাদের?"

হঠাৎ হেমবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠেন, হন্‌হন্‌ করে চলে যেতে যেতে বলে ওঠেন, "একটু পরে আমি ঘুরে আসছি খগেনদা—"

দশ

এতক্ষণ অনাদির ছিল নানান সন্দেহ, দোদুল্যমান মনের অবস্থা। এইবার সব কিছুরই নিরসন হয়ে গেছে। এখন যেন মনের সঙ্গে লড়াই নেই! চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল অনাদি, অনেকক্ষণ সে সোজা আর শক্ত হয়ে বসে আছে। ভাগ্য তার নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে—সিকিউরিটী এ্যাক্টে সে বন্দী। কারণ? কারণের প্রয়োজন হয় না সিকিউরিটী এ্যাক্টে! ক্ষিতিশবাবু, খগেনবাবু, হেমবাবু যদি মনে করেন, অনাদি একজন কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তার সংশ্রব আছে, তাহলেই যথেষ্ট।

তাহলেই তাকে আটক করা যেতে পারে, চাকরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে, সবই করা যেতে পারে এঁদের মেজাজ আর মর্জিমাফিক!

সুতরাং তার চাকরী শেষ, তার মানে জীবনও শেষ! তার মাকে এবার নামতে হবে মাস-মাইনের ঝিয়ের পর্যায়ে, তার ভাই দুটী হবে লোচ্চা, লোফার, পকেটমার, গুণ্ডা! আর চিণু! বিষন্ন হাসিতে ঠোঁটের কোণটা মুচকে যায় অনাদির। চিণুর দুর্জয় প্রতিজ্ঞা এবার থাকবে কোথায়! তাকে ছাড়া সে নাকি আর কাকেও বিয়ে করবে না! রেবতীবাবু যদি জোর করেন, তাহলে সে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসবে—এখন সে সাবালিকা।

অব্যক্ত একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে অনাদি। দেখে, খগেনবাবু হাই তুলে, তুড়ি বাজিয়ে আড়ামোড়া ভাঙছেন। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে নিয়ে খগেনবাবু স্টেটমেণ্ট লেখা খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন অনাদিবাবু, একটা সই করে দিন। কথাটা বললাম, রাখলেন না তো! রাখলে কিন্তু ভাল করতেন, আর জাতীয় সরকারকে সাহায্য করা তো আপনার কর্তব্য। তবে কথা কি জানেন, আমাদের কথা কিনা তাই প্রথমেই আপনার মনে হবে, নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে—" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন খগেনবাবু।

নড়াচড়ার কোন উদ্যোগ না করেই অনাদি বললে, "সই করতে কি আমি বাধ্য?"

মৃদু একটা হাসি খেলে যায় খগেনবাবুর মুখে চোখে, বললেন, "বাধ্য কিনা তা আমি জানিনা, তবে এইটাই নিয়ম—স্টেটমেণ্ট দিলে সইও একটা দিতে হয়—"

"কিন্তু স্টেটমেণ্ট তো আমি দিইনি, আমার কোন প্রয়োজনও ছিল না। আপনারা ধরে বেঁধে এনে জোর জবরদস্তি করে আদায় করেছেন—সইটা আপনিই করুন।"

ঝপ্ করে স্বর চড়ে যায় খগেনবাবুর, "একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছেন অনাদিবাবু। কেস্‌টা ছিল আপনার খুবই সাধারণ, কিন্তু আপনিই তাতে জট্ পাকাচ্ছেন। বলা যায়না, দু'একদিনে ছাড়া পেয়েও যেতে পারেন। কিন্তু আপনার চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি সহ্য করতে আমি নারাজ। শুধু শুধু ন'মাস জেলে ঘুরে আসা নিশ্চয়ই আপনি চান না, আর আমিও চাইনা সেভাবে আপনাকে ভোগাতে। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই অনাদিবাবু—" শেষের দিকে স্বরটা কেমন যেন গাঢ় হয়ে ওঠে।

নাঃ আর যেন পারছে না অনাদি! এদের সঙ্গে সেই ভোর থেকে কথা কাটাকাটি করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইবার তার দরকার একটু নিরিবিলি। সইটা পেলে যদি আপদ বিদেয় হয়, তাহলে না হয় সইই একটা সে করে দিলে। খাতাটা টেনে নিয়ে অনাদি খস্‌খস্ করে কলম দিলে চালিয়ে।

খগেনবাবু বললেন, "না পড়ে সই করাটা আপনার উচিত হয়নি অনাদিবাবু। পুলিশকে কখনও কোন অবস্থায় বিশ্বাস করবেন না। স্টেটমেণ্টটা একবার পড়ে নিন—"

খাতাটাকে ঠেলে দিয়ে অনাদি বললে, "তাতে আর কি লাভ হবে! যা করবার তা তো আপনাদের ঠিকই হয়ে আছে।"

খগেনবাবু খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, "সে আপনার খুশী। আপনাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলাম বলেই বলেছিলাম। এর পর হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে! আর রাস্তাঘাটে যদিই বা কখনও দেখা হয়, আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না—একথা আমি হলপ্ করে বলতে পারি। কিন্তু কি করব বলুন, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পড়াশুনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন চাকরীতে। আপত্তি একটু করেছিলাম,

কিন্তু এমন রেডিমেড্ চাকরীই বা পাব কোথায়, তা ছাড়া মাইনেটা দেয় ভালই আর নানান সুবিধাও পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভেবেছিলাম, আমাদের জীবনেও বুঝিবা কিছু পরিবর্তন আসবে। অন্তত এমন একটা কাজ আমাদের দেবে, যাতে মানুষে আমাদের এমন করে ঘৃণা করবে না—" ব্যথায় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমালে মুখটা মুছে নিলেন।

খগেনবাবুর প্রাণে বড় সাধ, তাঁর মেয়েটীর বিবাহ দেন কোন একটী অ-পুলিশ পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু তেমন পাত্র তিনি আজও জোগাড় করতে পারেন নি। পুলিশ ছাড়া পুলিশের মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। এ ব্যথা শক্তিশেলের মত বিঁধে আছে খগেনবাবুকে। তিনি যেন অনুভব করতে পারছেন, দিনের পর দিন তিনি সাধারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘৃণ্য একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছেন।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে, রিভলভারটাকে সার্টের তলায় গুঁজে উঠে পড়লেন খগেনবাবু, "তাহলে আপনি বসুন অনাদিবাবু, হেমবাবু এখনই আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবেন—" কাজ শেষ করার আরামে শরীরটা যেন তার হাল্কা হয়ে গেছে, হাল্কা মনে শিষ দিতে দিতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

পা দুটোকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে একটু আরাম করে বসে নিলে অনাদি। মাথাটা তার ঝিম্‌ঝিম্ করছে। ঘাড়টাকে রাখলে চেয়ারের কাঁধের ওপর। সমস্ত শরীরটার বাঁধন আলগা হয়ে আসছে। কাল এমন সময়ে সে অফিসে বসে কাজ করেছে! বিরজা তার বাড়ীওয়ালার অত্যাচারের কথা বলে পরামর্শ চেয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করে একটা মতলব স্থির করেছিল তারা, বাড়ীওয়ালাকে জব্দ করার!

কিন্তু আজ তো অফিস যাওয়াই হবে না, ছুটীরও দরখাস্ত পাঠান

হবে না। অফিসে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে—বিনা নোটিশে কামাই! কতলোকে কত রকমই না আন্দাজ করবে! কেষ্টবাবুর ছুটীর চিঠি পৌছতে একটু দেরী হলেই সকলে মনে করত, নিশ্চয়ই তাঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু, আজ যে তাকে পুলিশে ধরে এনেছে, এ বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। অফিসের মধ্যে সে-ই বোধহয় সবচেয়ে নির্বিবাদী লোক।

কিন্তু বিনা নোটিশে কামাই হলে তার টেম্পরারী চাকরীর মেয়াদ আর কতদিন! তাহলে চাকরীটী যে তার যাবেই, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই—জেল হলেও যাবে, না হলেও যাবে। কিন্তু তারপরও তাকে বেঁচে থাকতে হবে—সেইটীই হচ্ছে সমস্যা। এর আগে যখন চাকরী ছিল না, তখন সে ঠোঙা বানিয়েছে; দিনান্তে চার-পয়সার মুড়ি আর এক পেট জল খেয়ে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু তখন ছিল আশা, চাকরী একটা জোগাড় হবেই, আবার সে গড়তে সুরু করবে তার পরিকল্পনা-মাফিক জীবন।

কিন্তু এখন তার সামনে কি! জেলের গরাদের মধ্যে তাকে খাইয়ে পরিয়ে বসিয়ে রাখবে। তার থেকে একদানা বাঁচিয়ে সে পাঠাতে পারবে না সুজিত আর অজিতের জন্যে। আকাশভেদী পাঁচিল ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে তার জীবন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে, হয়তো একদিন ঝরে পড়বে সবার অলক্ষে!

কিন্তু, চিণুর কি হবে? চিণু যে তাকে অবলম্বন করে সমাজের বিরুদ্ধে, এমন কি তার অমন স্নেহময় বড়ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করেছে! চিণু বলেছে, 'মেয়ে হলেও, আমিও যে মানুষ, এইটাই আমি এদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব।'

এবার যখন অনাদি দেশে গিয়েছিল, তখন চিণু তাকে প্রথমেই দেখিয়েছিল তার পড়ার বইগুলো। আজকের দিনে ষোল-সতেরো

বছরের একজন তরুণীর পক্ষে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীর খানকয়েক বই তার প্রেমাষ্পদের কাছে দেখানর মধ্যে কতখানি হাস্যকরতা থাকতে পারে, সে চেতনা চিণুর মধ্যে ছিলনা। বড়ভাই রেবতীবাবুর অসীম আদরের বোনটী চিণু একদিন দাদার অনিচ্ছা সত্বেও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল তার বারো-তেরো বছর বয়সে। সেদিন সে মনে করেছিল, মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়—ওটা পুরুষদের কাজ। চিণু সেদিন শুধুই মেয়ে হতে চেয়েছিল। কিন্তু তার নিজের বিবাহে নিজস্ব মত প্রকাশের ফলে যে বিরোধীতা এল তার অতি আপনার জনেদের কাছ থেকে, বিশেষ করে তার পিতৃতুল্য বড়ভাই রেবতীবাবুর কাছ থেকে, তাতে চিণুর জীবনের মূলই বোধহয় গিয়েছিল নড়ে। প্রথমে ভেবেছিল, ওটা বুঝি সাধারণ ভাবে তার কোন একটী আব্দারকে বাধা দেওয়ার মত। কিন্তু ধীরে ধীরে চিণু বুঝতে পারে, ব্যাপারটা ঠিক অতখানি সহজ আর সাধারণ নয়! শাড়ী, গয়নার জন্যে তার আব্দারের একটা মূল্য আছে! কিন্তু কোন মূল্যই কি নেই তার নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তার নিজস্ব মতামতের! ব্যাপারটাকে অত সহজে মেনে নিতে পারেনি চিণু, কান্নাকাটি, রাগ অভিমান করে বাড়ী মাথায় করে তুলেছিল। কিন্তু রেবতীবাবু অটল। পাড়া প্রতিবেশী আত্মিয়-স্বজন সকলেই এসে চিণুকেই দিলেন ধিক্কার। বেবাক্ বিস্ময়ে খুড়িমা, জ্যেঠিমা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'বিয়ের কথা নিয়ে মেয়েমানুষের এমন বেহায়াপণা জন্মেও দেখিনি বাপু!'

বইগুলো মেলে ধরে চিণু তার ডাগর চোখ মেলে অনাদিকে প্রশ্ন করেছিল, 'দু'বছরে আমি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারব না?' অনাদির মনে হয়নি, তা সম্ভব—তবুও বলেছিল, 'নিশ্চয়ই পারবে, একটু বেশী খাটতে হবে।' তারপর চিণু তার পরিকল্পনার কথা বলে গিয়েছিল একে একে। ম্যাট্রিকটা পাশ করেই সে চলে যাবে কলকাতায়, তার

দিদির বাড়ীতে। তার অশিক্ষিত দিদি বিয়ের পর ম্যাট্রিক পাশ করেছে—এখন চাকরীও একটা করছে! তার জামাইবাবু একজন কমিউনিষ্ট।

এস্, বি, অফিসের অন্ধকার এক কুঠরিতে বসে অনাদি ভাবছে চিণুর সমস্যার কথা। তাহলে চিণু এবার করবে কি? বিয়ে করতে গেলে একটা মানুষের জীবনে স্থিতি চাই, স্থায়ী একটা আয় না হলেই নয়! কিন্তু সে তো আজ সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারি! তার অক্ষমতা আজ চিণুর দুর্জয় প্রতিজ্ঞাকে যদি টলিয়ে দেয়! সে তো কোন সাহায্যই করতে পারবে না চিণুকে! না না, চিণুর উচিত তার দাদার কথামত বিয়ে করা। কিন্তু চিণুর যে ঘৃণা ওই ধরণের বিয়ের ওপর! তাকে দেখতে আসার একটা বিবরণ দিয়েছিল চিণু, সে কথা মনে হতেই অনাদির সমস্ত শরীরটা ঘিণঘিণ করে ওঠে। চিণু বলেছিল, 'দেখতে আসা নয়তো, যেন হাটে লাউ কিনতে আসা। নখ ফুটিয়ে, বাজিয়ে, হাতের ওপর নাচিয়ে দেখবে বেশ কচি কিনা! তারপর সুরু হবে দরাদরি। অমন বিয়ে করার চেয়ে আমি পুকুরে ডুবে মরব।'

নির্জন, অন্ধকার ওই ঘরে একা বসে থেকেও অনাদি আঁতকে ওঠে। সে জানে, চিণু ও কাজ অনায়াসে করতে পারে। সেই বই দেখানর সময়কার চিণুর ডাগর চোখ দুটো ভেসে ওঠে তার চোখের ওপর। যে মানুষ এত সরল আর এত খাঁটি, সে পারে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও তার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু চিণু কি বুঝবে না আজকের বাস্তব অবস্থা। সে চাকরী করার জন্যে নিজেকে তৈরী করছে। কিন্তু কোথায় চাকরী! এদেশে পুরুষদের জন্যেই যথেষ্ট চাকরী নেই, পুরো একটা বছর সে-ই তো বেকার অবস্থায় ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় রাস্তায়, অফিসের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছে! কিন্তু কে দিয়েছে তাকে চাকরী!

আর চাকরী যদিই বা জোগাড় করতে পারে চিণু, তাহলেও চাকরী তার কিছুতেই করা উচিত নয়। দেখেছে সে মেয়েদের চাকরী করতে তার নিজের অফিসেই। যে দেশে পুরুষের মন এত নোঙরা, এত কদর্য, তাদের পাশাপাশি বসে চিণু কাজ করবে, একথা ভাবতেও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সব কটা মানুষ হ্যাঙলার মত চেয়ে থাকবে চিণুর মুখখানার দিকে; একবার চোখোচোখি হলেই গ'লে যেন চট্‌চটে হয়ে উঠবে, আর কারণে অকারণে উঠে গিয়ে তার গা ঘেঁষে একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওদের মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে থাকে, সেটা এক কথায় প্রকাশ করেছিলেন বিরজাবাবু ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর। অফিসের মহিলা কর্মচারীরা তখনও কাজে যোগ দেন নি—বিরজাবাবু ভারী খুশী! হেসে খুশীর কারণটা ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'জানেন অনাদিবাবু, দাঙ্গা বেঁধে একটা বড় লাভ হয়েছে। এই মাগীগুলোর রাস্তায় রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়ানটা বন্ধ হয়েছে। আর ট্রামে বাসে একটু বসে আসা যাচ্ছে···ওদের জ্বালায় কি আর বসবার যো ছিল!'

পা গুটিয়ে নিয়ে হঠাৎ ঝপ্‌ করে উঠে বসে অনাদি, 'কেন চিণু এমন অপমান সহ্য করবে?' চিণু কি বুঝবে না এ সমস্ত কথা! অস্থির হয়ে ওঠে অনাদি···কেন চিণু এরকম করে! চিণু কি তার প্রেমে পাগল হয়ে গেল নাকি! না, নাটক নভেল পড়ে সে উপন্যাসের নায়িকা হতে চায়! কিন্তু কোনটাই যেন চিণুর সম্বন্ধে খাটে না। ছেলেমানুষের মত খুশী নিয়ে চিণুর একখানা একখানা করে বই খুলে খুলে দেখানর দৃশ্যটা চোখের ওপর ভাসতে থাকে···ইংরেজী প্রাইমার, সন্দর্ভ সুধা, মোহারাম শিরোরত্নের বাঙলা ব্যাকরণ, তারপর কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের হাতের লেখার খাতা। তারপর ডাগর দুটী আঁখি মেলে সেই প্রশ্ন, 'দুবছরের মধ্যে আমি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারব না?'

একেবারে তার কানের গোড়ায় হেমবাবুর কণ্ঠস্বরে অনাদি দারুণ

চমকে ওঠে। হেমবাবু তখন বলছেন, "তাহলে আপনার জন্ম কিসের অর্ডার দেব ?"

আকস্মিক এই প্রশ্নের সঠিক তাৎপর্য ধরতে না পেরে অনাদি বলে ওঠে, "এঁ্যা ?"

নিজেকে থিতিয়ে নিয়ে হেমবাবু বললেন, "আপনি ভাত খাবেন না খাবার খাবেন ?"

হঠাৎ অনাদি ফেটে পড়ল, "বিষ খাব—আমি বিষ খাব—"

মুচকে হেসে হেমবাবু বললেন, "রসিকতা করছেন ! তা বেশ তো কিন্তু—"

হেমবাবুর কথা শেষ করতে দেয় না অনাদি। কেষ্টবাবুর মতই প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, "আপনাদের ওই মুচকে মুচকে হাসি আর দাঁত চাপা অমায়িক ব্যবহার দেখে আমার বিষ খেতে ইচ্ছে করছে।"

চোখদুটো হেমবাবুর কুঁচকে ওঠে, ক্রুর একটা হাসিতে মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন, "মাত্র ঘণ্টা কয়েকেই এই অবস্থা—এখনও তো ঢের বাকী !"

ঝপ করে অনাদি উঠে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠটা শক্ত করে একহাতে চেপে ধরে, সোজা আর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। শরীরটা তার থরথর করে কাঁপছে। হেমবাবুর মুখের সামনে তর্জনি নেড়ে অনাদি তার সমস্ত শক্তি কণ্ঠে ঢেলে দেয়, "একটা মানুষকে নিয়ে এভাবে রসিকতা করার কোন অধিকার আপনাদের নেই—"

চট্ করে এক পা পেছিয়ে যান হেমবাবু—ডান হাতটা চলে যায় তাঁর সার্টের নিচে কোমরের ওপর। অনাদির চোখের ওপর চোখ রেখে হেঁকে ওঠেন, "দরোয়াজা—"

দরজার গোড়া থেকে উঠে আসে সিপাইটা। হেমবাবু হুকুম দেন, "পকৃড়ো উসকো—"

সোজা অনাদির সামনে এসে সিপাইটা তার প্রসারিত হাতখানার কব্জিটা খপ্ করে ধরে ফেলে। হেমবাবু আবার হুকুম দেন, "লক্ আপমে লে যাও—"

অনাদির হাত ধরে একটা হেঁচকা দিয়ে সিপাইটা গর্জে ওঠে, "আ রে চল্—"

এগারো

ঘরের পর ঘর পার হয়ে অনাদি চলেছে সিপাইটার প্রবল মুঠির চাপে আবদ্ধ হয়ে। বিস্ময়ে সে হতভম্ব হয়ে গেছে, এই লোকটাই আর কিছুক্ষণ আগে তাকে বলেছিল, 'ডরো মৎ বাবু, কম্যুনিষ্ট লোক কভ্ভি ঘাবড়াতা নহি!' অথচ সেই একই লোক সোজা এসে তার হাতটা চেপে ধরল!

বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে উঠানের উপর এসে পড়েছে অনাদি। নির্জন উঠানের চারিদিকে বারেক মুখ ঘুরিয়ে দেখে নেয় সিপাইটা। আরও খানিকটা চলতে চলতে অনাদি অনুভব করতে পারছে, তার কব্জির ওপর চেপে বসা কড়া আঙুলগুলো কেমন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে! কেমন যেন এক সঙ্কোচ আর অস্বস্তি জেগে উঠেছে আঙুলগুলোয়! আরও খানিকটা চলার পর অনাদির হাতখানা আপনা হতেই খসে পড়ে সিপাইটার মুঠো থেকে। এক বিস্ময় থেকে আর এক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে অনাদি, তাহলে এদের মধ্যেও লজ্জা সঙ্কোচের বালাই আছে!

উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে অনাদি লক্ষ্য করে, ওখানে অনেক আলো! বেলা তখন প্রায় দশটা, রোদ ঝল্মল্ করছে, আলোয়

চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। অনাদির ইচ্ছে হয়, আরও একটুখানি সে ওই খোলা জায়গাটার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সিপাইটা আবার তাকে ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে গেছে। অনাদি ডাকলে, "সিপাইজী..."

সিপাইটা পেছন ফিরে তাকায়। অনাদি তাকে কাছে ডাকে, "শুনিয়ে তো..."

অনাদির কাছে এসে সিপাইটা নরম স্বরে শুধোয়, "বলিয়ে, ক্যা মাঙতা ?"

প্রস্রাবখানার খোঁজ করে অনাদি। সিপাইটা সচকিত হয়ে ওঠে, আতিথেয়তার দরদভরা কণ্ঠে বলে, 'আইয়ে হামারা সাথ্'—যেন কয়েক মিনিট আগেকার 'আ বে চল্...'ভাষণটাকে মুছে দিতে চায় অনাদির স্মৃতিপট থেকে।

মাঠটার কোণাকুণি পায়ে চলার রাস্তা, তারই শেষপ্রান্তে ছোট ছোট একসারি ঘর। ডান পাশে বাড়ীটার সামনে দিকটা আর বাঁ পাশে বাগান। বাগানটা হয়তো ছিল এককালে সাজান গোছান, কিন্তু আজ গাছগুলোর গোড়ায় গোড়ায় জমা হয়েছে রাজ্যের জঞ্জাল। কেমন একটা গ্রাম্য আবহাওয়া সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। বড় বড় আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, হরেক রকমের ফলের গাছ—গাছে গাছে নানান জাতের পাখির কলরব। এত গাছ, এত ফল, এত পাখি দেখলে আজও অনাদির কাপড়টা বাগিয়ে নিয়ে গাছের ওপর উঠে বসতে সাধ জাগে।

মাঠটার শেষ প্রান্তে এসে অনাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাঁচিলের গায়ে দাঁড় করান রয়েছে বিরাট এক সাইন বোর্ড—'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, কলিকাতা জিলা কমিটী'! তার পাশেই রয়েছে একখানা এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান্—তার গায়ে লেখা পিপল্স্ রিলিফ কমিটী! কেমন যেন ব্যথা লাগে অনাদির মনে। ওই কেষ্টবাবু আর রসময়বাবু, আর আরও কত, কত শ্রমিক, কৃষক, কেরাণী, মহিলা, দিনের পর দিন তিল

তিল ত্যাগ দিয়ে গড়ে তুলেছে এই পার্টি। মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কত কষ্ট, কত ঘৃণা, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা তাঁরা পেয়েছেন তাদেরই কাছে। তবুও তাঁরা ক্ষুব্ধ হননি, বারবার তাদের দুখের দিনে তাঁরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, বিপদে আপদে বুক পেতে দিয়েছেন সবার আগে এগিয়ে গিয়ে। আজ যেন অনাদি অনুভব করতে পারছে রসময়বাবুকে। মনে পড়ছে তাঁর সেই আকুল আহ্বান, 'আসুন অনাদিবাবু, কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এসে দুনিয়াজোড়া শোষিত মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানবতার মুক্তির জন্যে লড়াই করি—'

প্রায় সমস্ত চত্বরটার ওপর একটা পাক দিয়ে অনাদি এসে হাজির হল লক্-আপ্ রুমের সামনে। ছোট্ট একটা খুপরি। লোহার গরাদ দেওয়া দরজা আর পেছনের দেয়ালে মেঝে থেকে অন্তত ছ'ফুট ওপরে ছোট একটা ঘুলঘুলি—সেখানেও লোহার শিক্ বসান। ঘরের মেঝে একটা তক্তাপোষ, তার মাঝখানের কয়েকটা তক্তা ভেঙে গিয়ে মস্ত এক ফুটো।

দুটো সিঁড়ি উঠে, চৌকাঠের সামনে অনাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখ দুটো বড়বড় করে তাকিয়ে থাকে ঘরটার কোণে কোণে জমে থাকা অন্ধকারের দিকে। মনে হয়, যেন ওই কোণগুলোয় জমে আছে কত গুম্‌রানি—অসীমদার মত কত নির্ভীক তাজা মানুষের টিপে ধরা গলা থেকে বেরিয়ে আসা গোঙানি! চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে মনটা কেমন বিরোধী হয়ে ওঠে। এতক্ষণে অনাদি জেনেছে, ওই অন্ধকূপের মধ্যে ঢুকতে তাকে হবেই—নাহ'লে আছে ওদের সিকিউরিটী এ্যাক্ট, তারই বলে বলীয়ান সিপাই শান্ত্রী এসে ধরেবেঁধে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দেবে তাকে, আর অতি অমায়িক ক্ষিতিশবাবু, খগেনবাবু বলবেন, 'আপনি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছেন অনাদিবাবু!' তবুও অনাদির

ওই চৌকাঠটাকে মনে হচ্ছে হাড়িকাঠ! সারা বাঙলার যুবশক্তি যখন ত্রিশ সালে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বৃটীশের বিরুদ্ধে, তখন দিনের পর দিন অগণন যুবককে এরা ধরে এনেছে এই 'ইলিসিয়াম রো'তে, তারপর অত্যাচারে, নিপীড়নে সেই শক্তিকে দিয়েছে থেঁতলে, গুঁড়িয়ে।

কিন্তু সে দিনকাল তো আর নেই! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক ডজন বার সে শুনেছে ওই একই কথা। তবুও কেন আজও সেই একই লক্-আপ—আজ উনপঞ্চাশ সালে সেই একইভাবে অগণন যুবককে ধরে আনা, তারপর সিকিউরিটী এ্যাক্টের বলে তাদের জীবনকে থেঁতলে গুঁড়িয়ে দেওয়া! এমন সমস্যায় অনাদির আবার মনে পড়ে যায় রসময়বাবুর সেই কথা, 'কিন্তু সে স্বাধীনতা তো আসেনি অনাদিবাবু! লোকচক্ষের আড়ালে, দেশের মানুষের বুদ্ধির অগোচরে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা আপনার আমার জন্যে নয়।'

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় অনাদির হেমবাবুর হেঁড়ে গলার চিৎকারে, "কইরে কেষ্টা, দৌড়ে চলে যা—বেশ বড়বড় লুচি, বেশী করে নিয়ে আসবি, আর একেবারে গরম গরম—আর মিষ্টি—আর ফলের কথা ভুলিসনি যেন। যা ঝট্‌পট্—দৌড়ে যাবি আর আসবি—"

এই কথাগুলো কেষ্টাকে বলার সময় হেমবাবুর মুখের চেহারাটা হয়েছে কেমন, দেখার জন্যে অনাদির মনটা কুতুহলি হয়ে ওঠে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলে, হেমবাবু রীতিমত গম্ভীর! অনাদি ভেবেই পেলে না, তবে কেন তার মনে হয়েছিল, কথাগুলো তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলার সময়ে হেমবাবু নিশ্চয়ই মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন!

বাচ্চা একটী সিপাইকে অনাদির সামনে এনে পূর্বতন সিপাইটী বললে, "এহি সিপাই রহেগা আপ্‌কো পাস্ পাহারাপর্—হামারা ডিউটী হ্যায় দুস্‌রী জাগাহ—"

নতুন পাহারাদার বাচ্চা সিপাইটী বললে, "ঘরকা অন্দর যাকে আরামসে বৈঠ্ যাইয়ে—"

চকিতে অনাদি বাচ্চা সিপাইটীর মুখের দিকে চায়—এ যেন নতুন এক স্বর! ক্ষণেকের জন্যে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অনাদি ঢুকে পড়ল লক্-আপ্ রুমের মধ্যে। তক্তাপোষটার ওপর বসে চটি থেকে পা দুটো নিলে বার করে। পা গুটিয়ে বসে ধরালে একটা বিড়ি। সত্যিই যেন আরাম লাগছে। খুব আলতোভাবে পর পর দুটী বিলম্বিত টান দিতেই সমস্ত শরীরটা যেন চন্‌মন্ করে উঠল। মনে পড়ল, অনেকক্ষণ সে বিড়ি খায়নি! বেলার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তা সাড়ে দশটা নিশ্চয়ই বেজে গেছে। অফিস গম্‌গম্ করছে, ঝড়ের বেগে চলেছে কয়েকটা টাইপ-রাইটার একই সঙ্গে। মনে মনে হিসেব করে দেখলে অনাদি, এতক্ষণে তার পাঁচ ছ'ঘণ্টার বন্দী জীবন গেছে কেটে! আর এইতো স্বরু—এরপর মেয়াদ সাতদিনও হতে পারে, আবার ন'মাসও হতে পারে! তার মানে, যাই হোক না কেন চাকরীটা তার গেল!

কিন্তু চাকরী যদি যায়, তাহলে এবার কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে? বৃটীশ আমল তো আর নেই, দেশের নেতারা এখন সরকারী গদীতে! আর কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী, রসময়বাবু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, ইউনিয়ন অফিস কার্যত বন্ধ—ইন্‌ফর্‌মার্, ওয়াচার্‌রা খোলাখুলি বসে থাকে সকলের নাকের ডগায়!

শরীরটাও ঝিমিয়ে আসছে অনাদির, সেই কোন সকাল থেকে চলেছে টানা-পোড়েন! ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা, শুয়ে পড়তে রীতিমত লোভ লাগছে। ঘুমিয়ে পড়তে পারে বুঝতে পেরেও অনাদি শুয়ে পড়ল ধনুকের মত বেঁকে ভাঙা জায়গাটাকে এড়িয়ে। বুকের গভীর অতল থেকে অনাবিল আরামের একটী শব্দ বেরিয়ে এল, "আঃ।" নড়েচড়ে, কাৎ হয়ে, পাশ ফিরে, বেশ করে গুছিয়ে শুলে

অনাদি, এইবার সে ঘুমিয়ে পড়বে। আর ঘুমিয়ে পড়লেই বা কি! হারিয়ে যাওয়ার মত আর কিছুইতো অবশিষ্ট নেই—জীবন তো তার শেষ হয়ে গেছে! হঠাৎ অনাদির মনে হয়, এ যেন 'চরিত্রহীনে'র শেষ দৃশ্যে কিরণময়ীর ঘুম! বইটা পড়া শেষ করে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তার শরৎবাবুর ওপর। কেন কিরণময়ী অমন ভাবে ঘুমোবে! তার জীবনের ঈপ্সিতকে আয়ত্ত করতে গিয়ে কিরণময়ীর জীবন হয়েছে বিধ্বস্ত, ভেঙে-চুরে খান্‌খান্ হয়ে গেছে তার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা। তাই পরাভূত, বিধ্বস্ত কিরণময়ী ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ল! সমাজে কি তার এতটুকু স্থান হল না সজাগ, জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকবার! বইখানা অনাদি পড়েছিল মাত্র মাসখানেক আগে। তখন তার পরিকল্পনা বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে, এইবার সে মাকে নিয়ে আসবে, এইবার সে চিণুকে বিয়ে করবে, এইবার সে বাঁধবে ঘর!

চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠছে, মনটাও যেন এলোমেলো হয়ে আসছে অনাদির। সব কিছুকে ছাপিয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে চিণুর মুখখানা। মুখখানা চিণুর সত্যিই সুন্দর! কত সাধই না তার জেগেছে ওই মুখখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে। কত কথা যে খল্‌বলিয়ে উঠেছে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। সে সমস্ত কথা বুঝিবা ছেলেমানুষির কথা, শিশুর কাকলি! তবুও বহুবার ইচ্ছে হয়েছে, চিণুর কোলে মাথা রেখে, ওই সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে কথা বলে যায় অনর্গল—তার বুকে যত সাধ, যত আশা গুমরে গুমরে মরে—তারই কথা। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারেনি, কোন কথাই বলা হয়নি। এমন কি মুখের কথায় একটু প্রেমজ্ঞাপন করার অবসরও আসেনি তার জীবনে। যান্ত্রিক ভাবে কেবল ভেবেছে বিয়ের ব্যবস্থার কথা, টাকার অঙ্ক হিসেব করে সংসার পাতবার কথা। নতুন জীবনের কথা বুঝিবা মনের ধারে কাছেও পারেনি আসতে!

ক্ষীণ একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে অনাদির ক্লান্ত ঠোঁটের কোণে! পড়ো বাড়ীতে কিরণময়ীর প্রথম উজ্জ্বল আবির্ভাব আর শেষ দৃশ্যে তার অনাবিল শান্তির ঘুম, দুটোই বুঝি সত্যি! তার নিজের জীবনের মত কিরণময়ীর জীবনও সত্যি, একেবারে সত্যি! চোখের পাতা নেমে আসে ধীরে ধীরে। অনাবিল আরামের অব্যক্ত সেই শব্দ মাঝপথে থেমে যায়, আঃ...

হেমবাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল অনাদির। আচমকা উঠে বসেই বললে, "আবার কোথায় যেতে হবে?"

করুণার হাসি হেসে হেমবাবু মিহি সুরে বললেন, "নাঃ আর কোথাও যেতে হবে না। আপনার খাবার এনেছে—খেয়ে নিন। দেরী হলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! এমন অনুযোগ এক মা ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত করেনি। বিস্ময়ভরা চোখে হেমবাবুর মুখের পানে চোখ তুলে চায় অনাদি।

ব্যস্তসমস্ত হেমবাবু তড়বড়িয়ে বলে উঠলেন, "নিন অনাদিবাবু, আর দেরী করবেন না। বুঝলেন না, দালদায় ভাজা লুচি, ঠাণ্ডা হলে তো মুখেই তুলতে পারবেন না।"

চোখ দুটো আপনা হতেই কুঁচকে আসে অনাদির। হেমবাবুর ওই মুখখানার পাশে ভেসে উঠছে তাঁরই আর একটা মুখ, যখন তিনি সিপাইটাকে হুকুম দিয়েছিলেন, 'পকড়ো উস্‌কো!'

হেমবাবু হাত কচলে বললেন, "তাহলে খেতে দিক্ আপনাকে?"

অনাদির সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই কেষ্টা তক্তাপোষের ওপর একটা শালপাতা বিছিয়ে খাবার দিতে আরম্ভ করে। হেমবাবু হন্‌হন্

করে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "যদি কিছু দরকার পড়ে আমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

খানছয়েক পুরি, খানিকটা কুমড়োর ঘ্যাঁট, কড়ে আঙুলের মাপে একটা কলা আর একটা রসগোল্লা, যুদ্ধপূর্ব যুগে যাকে বলা হত রসমুণ্ডি। বেশ করে সাজিয়ে দিয়ে কেষ্টা সোজা হয়ে দাঁড়াল। খাবার থেকে চোখ সরিয়ে অনাদি চাইলে কেষ্টার মুখের দিকে। মুখটা কাঁচুমাচু করে কেষ্টা পেছিয়ে দাঁড়াল আরও এক পা। হঠাৎ অনাদি খিঁচিয়ে ওঠে, "নিয়ে যা তোর খাবার—আমি খাবনা—"

দাঁত দিয়ে বাঁ হাতের নখ কাটতে কাটতে কেষ্টা বললে, "আমি কি করব বাবু, সকলকেই তো এই খাবারই দেওয়া হয়—"

অনাদি আরও জোরে তাড়া করে ওঠে, "তুই নিয়ে যা বলছি, আর হেমবাবুকে বলগে যা, আমি খাব না।"

কেষ্টা একবার এ ঠ্যাঙ, একবার ও ঠ্যাঙের ওপর ভর বদলে নিয়ে বললে, "খাবনা বলবেন না বাবু, তাহলেই হাঙ্গার ষ্ট্রাইক হয়ে যাবে। আগে তো আপনাকে নিয়ে গিয়ে পুরবে পিসিডিস্সি জেলে, তারপর জিজ্ঞেস করবে, কেন খাবেন না। এ বড় খচ্চর জায়গা বাবু—"

অনাদির অলক্ষ্যে বসে থাকা রিসেপ্‌শন্ রুমের সেই যুবকটী বলে উঠল, "জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার, যা পেয়েছেন আগে তো খেয়ে নিন—"

চমকে অনাদি পেছন ফিরে চাইলে। যুবকটী বললে, "বুঝলেন না ব্যাপারটা? রিসেপ্‌শন্ রুমের সেই সিপাইদের অভিযোগ! 'তলব্‌সে তো কাম্ নহি উঠ্‌তা'। কাজেই হেমবাবু রেখেছেন ফিফ্‌টি পার্সেন্ট আর এই কেষ্টা কোন না টেন্ পার্সেন্ট—সুতরাং আপনার ভাগ্যে আর ওর বেশী জুটবে কেমন করে!"

অনাদি বললে, "কিন্তু এই খাবার খেলে যে খিদে আরও বেড়ে যাবে! তার চেয়ে না খাওয়াই ভাল।"

হেসে যুবকটী বললে, "তা যা বলেছেন। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যা পেয়েছেন, উপস্থিত ওগুলো খেয়ে নিন। তারপর যখন ইন্‌টারোগেশনে নিয়ে যাবে তখন বেঁকে বসবেন, পেট ভরে খেতে না দিলে কথাই বলতে পারছি না।"

হাসি পায় অনাদিরও, "তা যা বলেছেন। যেমন ছ্যাঁচড়া এরা, ছ্যাঁচড়ামী ছাড়া এদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।"

লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল কেষ্টা। যুবকটী বললে, "ওই ছোঁড়াটা হেমবাবুর একটী পাকা সাকরেদ—চলল আমাদের সমস্ত কথাবার্তা বলে দিতে।"

খেতে আরম্ভ করে অনাদির মনে হল, এরকম ভাবে জমিয়ে গল্প করাটা বোধহয় ভাল হল না। খগেনবাবু বারবার বলেছেন, তার কেস্‌টা খুবই সিম্পল্—

হন্তদন্ত হয়ে হেমবাবু এসে ঢুকলেন মিনিট দুয়ের মধ্যেই। বিয়ে বাড়ীর কর্মকর্তার মত সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি অনাদিবাবু, খাবার ভাল তো? আর বেশ গরম আছে?"

অনাদি বললে, "তা তো আছে, কিন্তু এই কি সব! আর পাওয়া যাবেনা?"

বিনয়ে কুঁচকে গিয়ে হেমবাবু বললেন, "এই তো মুস্কিলে ফেললেন! এই-ই হল এখানকার কোটা এর বেশী দেওয়া আমার এক্তিয়ারে নেই।"

মাঝখান থেকে যুবকটী টপ্ করে বলে ওঠে, "তবে কার এক্তিয়ারে আছে?"

চোখ কুঁচকে হেমবাবু যুবকটীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "এই নিয়ে বোধহয় আপনার তৃতীয় দফা?"

যুবকটী বললে, "আপনারা যখন প্রেমে পড়েছেন, তখন তৃতীয় কেন, তিন শো বার হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—"

হেমবাবু রীতিমত গম্ভীর হয়ে যান, "দেখুন হরিশবাবু, আপনি হচ্ছেন দাগী আসামী, আপনাকে তো আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রেসিডেন্সিতে চালান করে দেওয়া হবে। কিন্তু অনাদিবাবুর কেস্‌টা খুবই সিম্পল্ আর উনি আপনাদের পার্টির লোকও নন—কেন আর ওঁর ব্যাপারে নাক গলিয়ে ওঁর কেস্‌টা খারাপ করছেন?"

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে হরিশ, "আপনাদের ট্রেনিঙের তারিফ করতে হয় হেমবাবু! ডিভাইড্ এ্যাণ্ড রুল্ পলিশীটাকে এমন সুন্দর রপ্ত করেছেন যে, দেখে তাজ্জব ব'নে যেতে হয়। কিন্তু জানেনই তো, যেখানেই মানুষের ওপর অবিচার আর জুলুম হবে, সেখানেই আমরা নাক গলাব—"

কট্‌মট্ করে হরিশের দিকে তাকিয়ে ঝট্ করে মুখখানা ঘুরিয়ে নেন হেমবাবু অনাদির দিকে, "যাক্ অনাদিবাবু, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে চলবেন। আমরা কিছু বললেই তো তার উল্টো মানে করবেন—" চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে মুখ ফেরালেন।

অনাদি বললে, "এক কাজ করুন না হেমবাবু, আমি পয়সা দিচ্ছি, আরও কিছু খাবার আমার জন্যে আনিয়ে দিন। এই খেয়ে তো আর থাকা যায়না—"

হাত কচলে হেমবাবু বললেন, "সে উপায় তো নেই অনাদিবাবু, এর জন্যে ডি, সি'র স্পেশ্যাল হুকুম চাই—"

আবার হরিশ মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "বেশ তো সেই স্পেশ্যাল হুকুমটাই না হয় আনিয়ে দিন।"

হরিশের দিকে চোখ পড়তেই হেমবাবুর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনাদিকে বললেন, "তার দরকার

হবে না অনাদিবাবু, আবার দেড়টার সময় পাবেন টিফিন, তারপর লালবাজার লক্-আপ্ য়ে তো সন্ধ্যে উত্ রোলেই খাওয়া। বুঝলেন না, আজকের দিনটা কোনমতে কাটিয়ে দিন—কাল থেকে আপনার খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না—” আর বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঘরের চৌকাঠ পার হতে না হতেই হরিশ যেন তার কথাগুলো হেমবাবুর পিঠের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে, “ঠিক কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য পরিকল্পনার মত! এখন অনাহারে মরে যাও, বড়জোর আধপেটা খাও—তিনবছর পরে খাদ্যের আর কোন অভাব থাকবে না।”

চৌকাঠের দুদিকে দুটো পা রেখে হেমবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, “দেখুন হরিশবাবু, আপনাকে ওয়ার্ণিং দিচ্ছি। এ জাতীয় কথাবার্তা অন্তত এস্, বি, অফিসে বসে চলবে না—”

মুহূর্তে হরিশের মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে, এক ঝলক রক্ত তার হাড়সার মুখখানাকে রক্তাভ করে তোলে। তক্তাপোষটার একেবারে কিনারে এগিয়ে এসে বলে ওঠে, “দেখুন হেমবাবু, বয়েস আপনার অল্প, বাঁচবেনও অনেকদিন—এখনও মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে শিখুন। আপনার এই এস্, বি, অফিস, দু'জন গোয়েন্দা আর তিনজন পুলিশ দিয়ে বিপ্লব ঠেকাতে পারবেন না। কমিউনিষ্ট পার্টিকে আপনারা ক'জনে বেআইনী করতে পারেন, কিন্তু দেশের হাজারে হাজারে, লাখে লাখে সৎ আর সাধারণ মানুষ তাকে আরও বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। আপনারা দিনে দু'চারজন কমিউনিষ্টকে জেলে পুরতে পারেন, কিন্তু প্রতিদিনই দু'চারশো জন লোক কমিউনিষ্ট পার্টির আরও কাছে আসছে। ওয়ার্ণিং আপনি আমাকে দেবেন না হেমবাবু, আমাদেরই এখন সময় এসেছে আপনাদের ওয়ার্ণিং দেবার।”

কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় অনাদি। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে সে কি করতে পারে, ভেবেই কূল কিনারা পায় না। তবুও সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে হরিশের কথা ভেবে। এমন কথা বলার পর হরিশকে নিয়ে না জানি ওরা কি করে! ইচ্ছে করে, হরিশের আরও একটু কাছ ঘেঁষে গিয়ে বসে।

আর কোন কথা না বলে হেমবাবু 'হুম্' বলে একটা শব্দ করে বেরিয়ে গেলেন।

হরিশ ফিরছিল গতকাল রেল শ্রমিকদের একটা মিছিল থেকে। জমায়েৎ হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গাটাকে পুলিশে একটা রণাঙ্গন বানিয়ে তুলেছিল। রেল শ্রমিকরা কিন্তু পিছু হঠেনি। টুকরো টুকরো দলে ছড়িয়ে পড়ল স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, ইয়ার্ডে, শ্রমিক কোয়ার্টারের গলিতে গলিতে। তারপর উঠল স্লোগান। দিক্ দিক থেকে বেরিয়ে এল ছোট ছোট মিছিল। হরিশ ছিল সবার আগের মিছিলটায়। একটার পর একটা ছোট ছোট মিছিল এসে মিশতে লাগল হরিশের মিছিলটার পেছনে। তারপর চলল ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে, লোকো শেডের পাশ দিয়ে, শ্রমিক বস্তির গলি বেয়ে—হাজার হাজার মানুষের উত্তাল সেই জীবনস্রোত। ইয়ার্ড থেকে বেরোবার মুখে রাস্তার ওপর পুলিশ এসে রুখে দাঁড়াল—মিছিলের গন্তব্যস্থল রাস্তার মোড়টাকে আটকে। হরিশ বললে, 'পথ ছেড়ে দিন—রাস্তায় পৌঁছে মিছিল আমরা শেষ করব।' কিন্তু রিভলভার হাতে পুলিশ অফিসার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে—তার চোখে ধুলো দিয়ে এত বড় মিছিল! সে বললে, 'আমার হুকুম, এক পা-ও আগে বেড়ো না।' হরিশ ঝাণ্ডাটাকে দুটী হাতের মুঠোয় নিবিড় করে চেপে ধরল, তুলে ধরল আরও উঁচুতে, ইয়ার্ডের ফাঁকা মাঠের হাওয়া লাগছে তার ভাঁজে ভাঁজে—পত্ পত্ করে উড়ছে নিশান। হরিশ পা বাড়ালে—এক পা, দু'পা, তিন পা—জমাট একটা মানুষের স্রোত যেন

আসছে এগিয়ে—উত্তুঙ্গ বন্যাস্রোতের মত আসছে ধেয়ে—তার শিখরে হরিশ, দৃঢ়, ধীর, সদম্ভ পদক্ষেপে চলেছে এগিয়ে। রাইফেলধারী দুই পুলিশ নিশানা নিয়েছে হরিশের হৃৎপিণ্ড। হরিশ চলেছে এক পা, দু'পা তিন পা, মিছিলের সমস্ত অবয়ব অজগর গর্জনে ফুঁসে উঠছে স্লোগান। হরিশের চোখ সামনে বিদায়ী সূর্যের ওপর নিবদ্ধ, বললে, 'আর দশহাত আমাদের যেতেই হবে।' হরিশের বুকের ওপর রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ স্পর্শ করেছে—সেই অগ্নিভরা রাইফেলকে ঠেলে নিয়ে চলেছে মিছিলের হাজার মানুষের একটা মন!

মিছিলের পথ সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশেরা, কিন্তু হরিশকে ছেড়ে দেয়নি। রাতের বেলায় হরিশ যখন বাড়ী ফিরছে একা, তখন প্রাইভেট একটা মোটর থেকে সাধারণ পোযাকে একদল পুলিশ আর গোয়েন্দা তাকে গ্রেপ্তার করে। সারারাত কাটিয়েছে থানা-হাজতে, তারপর ভোর বেলায় এই এস্‌, বি, অফিসে।

হরিশ যেন হেমবাবুকে বলা কথার জের টেনে বলে ওঠে অনাদিকে, "এইটাই হচ্ছে আজকের সত্যিকার অবস্থা অনাদিবাবু। জানিনা আপনি আমাদের লোক কিনা, তবু আপনাকে বলছি, এইটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল, আমাদের শক্তি আজ কতখানি বেড়ে গেছে, সেই কথাটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। চীনের মুক্তি ফৌজ উল্কার বেগে বিশাল চীনকে শোষণ মুক্ত করছে, পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্রী সরকার—দেশে দেশে চলেছে দুর্বার মুক্তি আন্দোলন, আর সবার উপরে আছে সূর্যের দীপ্তি নিয়ে মহান সোভিয়েট ইউনিয়ন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে কায়েম হয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রব্যবস্থা—পৃথিবীর আশি কোটী মানুষ আজ শোষণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভয় আজ কারা পাবে অনাদিবাবু? আমরা, না ওই ছুঁচো-টিকটিকির দল—"

হরিশের কথার মাঝখানেই বাজখাঁই গলায় এক সিপাই হাঁক পাড়ল, "হরিশবাবু, আইয়ে—"

কেমন যেন আঁতকে ওঠে অনাদি। কোথায় নিয়ে যাবে হরিশকে! প্রেসিডেন্সি জেলে! এখনই! ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে অনাদি হরিশের মুখের দিকে। ডাক ছেড়ে তার বলতে ইচ্ছে করে, যাবেন না আপনি হরিশবাবু—

ঝট্ করে উঠে পড়ে হরিশ হাতটা বাড়িয়ে দেয় অনাদির দিকে। অনাদিও যন্ত্রচালিতের মত তার ডান হাতটা তুলে ধরে। শক্ত করে অনাদির হাতখানা চেপে ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে হরিশ বললে, "ভয় নেই কম্‌রেড্—জয় আমাদের হবেই।"

বারো

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় হরিশ লক্‌-আপ্ রুম্ থেকে। হঠাৎ যেন দুঃসহ এক স্তব্ধতা নেমে আসে ছোট্ট ওই খুপ্‌রিটার বুক চেপে। কেমন একটা অস্বস্তি লাগে অনাদির আর লাগে নিজেকে বড্ড একা একা। হরিশের কথাগুলো তখনও যেন ঘরের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। দুনিয়ার এত ব্যাপার, এত ঘটনা নিয়ে কোনদিনই সে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এত যে কাণ্ড ঘটে গেছে ইতিমধ্যে দুনিয়াটার ওপর দিয়ে, সে খবরটা এমন ভাবে জানার ফলে বিস্ময় তার উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে থাকে!

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আজ কমিউনিষ্টদের আয়ত্তে! আশি কোটি মানুষ আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন! সকলেই তারা পেট ভরে খেতে পায়, লেখাপড়া শেখে, চাকরী তাদের দেখ্-না-দেখ্ চলে যায় না! এমন

করে এ খবরগুলো অনাদি জানত না। জানত সে কিছু কিছু সোভিয়েটের কথা, শুনেছে সে পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলোর কথা, বিশ্বাসও সে করে চিয়াং-কাই-শেক্‌ পারবে না কমিউনিষ্টদের বাধা দিতে। কিন্তু খণ্ড খণ্ড এই ঘটনাগুলোকে এক করে সে তো হরিশের মত ওই দুর্দ্ধর্ষ শক্তিকে কোনদিন অনুভব করেনি!

আজব বলে মনে হয় অনাদির হরিশের ব্যবহার। সোজাসুজি সে কেমন বললে, 'জানিনা, আপনি আমাদের লোক কিনা!' ওদের লোক? তার মানে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য! ভয়ও কি নেই তার অমন খোলা-খুলি ভাবে নিজের পরিচয় দিতে! ভয় ওরা না হয় করে না হেমবাবুদের, কিন্তু ভাবনাও কি নেই ওদের নিজেদের জন্যে।

অনাদির নিজের চিন্তা কেমন যেন ঘুলিয়ে যায়। সে চেয়েছিল, বেশ করে গুছিয়ে ভাবতে, এই ধরে নিয়ে আসার ফলে তার অবস্থাটা দাঁড়াল কি? চাকরী যদি যায়, তাহলে বাড়ীর ব্যবস্থাই বা করবে কি, আর নিজেই বা চলবে কেমন করে! আর চিণুকেই বা সে কি লিখবে? আরও অপেক্ষা করতে! আরও এক বছর! কিন্তু এই এক বছরই তো সে সময় নিয়েছিল। সে এক বছরের অনেকখানিই তো কেটে গেছে, আর তো হাতে আছে মাত্র মাস তিনেক! তবে কি সে লিখবে, আরও অপেক্ষা কর, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচারে তুমি জর্জরিত হতে থাক, না হয় মরে যাও—তবুও তুমি অপেক্ষা করে থাক, কারণ, নিজের পায়ের ওপর আজও আমি দাঁড়াতে পারিনি!

ঝট্‌ করে অনাদির মনে হরিশের কথা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'ঠিক কংগ্রেসী সরকারের খাদ্য পরিকল্পনার মত! এখন অনাহারে মরে যাও, বড় জোর আধপেটা খাও—তিন বছর পরে খাদ্যের আর কোন অভাব থাকবে না।'

হরিশের কথা পাশে সরিয়ে রেখে অনাদি আবার ভাবতে থাকে,

অপেক্ষা করার কথাই বা চিণুকে লিখবে কেমন করে। সে একজন পুরুষ মানুষ, পৌরুষ বলে কোন কিছুই কি তার থাকবে না! একটা বছর সে সময় নিয়েছিল কিছু সঞ্চয় করার জন্যে। চাকরী থেকে পেয়েছে ষাট টাকা, সকাল বিকেল টিউশনি করে ত্রিশ টাকা—মোট নব্বই টাকা। তার মাকে পাঠিয়েছে কুড়ি টাকা, নিজের খরচ চালিয়েছে চল্লিশ টাকায়। বেঁচেছে ত্রিশ টাকা। প্ল্যান্ করেছিল অনাদি মাসে পঞ্চাশ টাকা জমান। তার জন্যে আর কুড়ি টাকার মত একটা রোজগারের ধান্দায় সে ঘুরছিল।

আরও প্ল্যান্ ছিল অনাদির, এই একটি বছরে অন্তত পাঁচশো টাকা সে জমাবে। আর এই পাঁচশো টাকার একটা বাজেটও সে কষেছিল। বিয়ের খরচা সারবে নমঃ নমঃ করে দুশো টাকার মধ্যে। দুশো টাকা রাখবে ব্যাঙ্কে আর একশো টাকায় পাতবে নতুন সংসার। ওই দুশো টাকা থাকবে বিপদে আপদে খরচের জন্যে! তা ছাড়া আরও ভাবনা ছিল একটা ইন্সিওর করার ব্যাপারে। তার অবর্তমানে চিণুর ভবিষ্যতের কথাটা বিয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

অনাদির নিজের জীবন-পর্যালোচনার মধ্যে আবার ঢুকে পড়ে হরিশ। হরিশ বলেছিল, আজকের এই পৃথিবীতেই আশি কোটি মানুষ এই সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছে—তাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের দেশের রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্রতো একটা এদেশেও আছে! হঠাৎ অনাদির মন অনুসন্ধানি হয়ে ওঠে—সে রাষ্ট্রশক্তি কই?

এমন প্রশ্ন, এমন সমস্যা অনাদির জীবনে আর বুঝি কখনও আসেনি! মনটা যেন তার হাঁপিয়ে ওঠে। ছোট্ট ওই খুপরিটার চার দেয়ালের মধ্যে দম যেন আটকে যায়। তার ইচ্ছে হয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে—সেই ঘাসে ঢাকা বড়বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা মাঠটায়—ওখানে অনেক আলো!

উঠে পড়ে অনাদি তক্তাপোষের ওপর থেকে। শরীরটাও কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। একটা হাই তুলে আড়ামোড়া ভাঙে। ওঃ সমস্ত শরীরটা তার ব্যথায় টনটনিয়ে উঠেছে! দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, বাচ্চা দুটী সিপাই মাটির ওপর উবু হয়ে বসে বাঘবন্দী খেলছে। অনাদির ইচ্ছে হয়, ওদের পাশে বসে সে-ও বাঘবন্দী খেলে। চৌকাঠ পার হয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই সিপাই দুটী তড়াক্‌ করে লাফিয়ে ওঠে, "বহার্‌ মত্‌ আও বাবু—কোই জরুরৎ হ্যায় তো বোলাও—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি। সিপাই দুটী তার দুপাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "চলিয়ে ঘরকা অন্দর—"

আর মুখ তুলে চায় না অনাদি, মাথাটা তার বিশমণ ভারী হয়ে উঠেছে, ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। ফিরে আসে অনাদি ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর—কতকটা যেন ধপাস্‌ করে বসে পড়ে তক্তাপোষের ওপর। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে তার! হরিশকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাওয়ার পর তার ওপর কি এই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত! খগেনবাবু আর হেমবাবু বারবার বলেছেন, কেস্‌টা তার খুবই সিম্পল্‌।

মাথার দুটো পাশ দুহাতে চেপে ধরে অনাদি। তক্তাপোষের ওপর বসে দরজার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে। চোখটা সোজা গিয়ে পড়ে এক ফালি বারান্দার ওপর, তার এক পাশে টিন দিয়ে ঘেরা চা তৈরীর জায়গা। কেষ্টা সেখানে বন্‌বন্‌ করে ঘুরপাক্‌ খাচ্ছে একটা কেট্‌লি আর গুটী কয়েক কাপ নিয়ে। বাবুদের টেবলে টেবলে চা দেওয়ার বন্দোবস্ত। অনাদির নজর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কেটলিটা তো ভালই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজে ঘষে তাকে ঝক্‌ঝকে করা! সব কটা কাপেরই আঙটা আছে আর জাতও ভাল—ঠেলাগাড়ী বা ফুটপাথের 'দো-দোআনা' ওয়ালা নয়! অনাদি বুঝে নেয়, হয়তো কয়েদীদের জন্যে

কেটলি আর চায়ের কাপের আলাদা বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু গ্রামের জমিদার বাড়ীর একটা ব্যবস্থার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বাবুদের জন্যে ভাল কাপ আর ভাল কেটলি—এ যেন অনেকটা জমিদার বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের জন্যে কড়ি বাঁধা হুঁকোর মত!

বাচ্চা সিপাইদের মধ্যে একজন ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়, তারপর অপরটীকে ডেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অনাদির সামনে এসে একজন উবু হয়ে বসে বলে, "ক্যা বাবু, তবিয়ৎ খারাব লাগতা? শির্ দুখ্‌তা?"

কেমন যেন সহৃদয় স্বর। এমন নরম কথা তার কলকাতার জীবনে বড় একটা সে শোনেনি। মাথা তুলে অনাদি তাকায় সিপাইটীর মুখের পানে। বাচ্চা একটী ছেলে, বছর চোদ্দ বয়েস! অনাদি বললে, "থোড়া পানি—"

বসে থাকাটী তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠে আর দাঁড়িয়ে থাকাটী ঝট্ করে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। প্রথমটী আবার ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, "পিয়োগে?"

কথা না বলে অনাদি মাথায় হাত দিয়ে দেখায়। মাথা তার বিষম ঘুরছে, শরীরটা হয়ে আসছে হাল্কা, মিন্‌মিনে ঘামে ভিজে উঠছে সমস্ত শরীর। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে অনাদির। বুঝিবা সে অজ্ঞান হয়ে যাবে!

"চলিয়ে হামারা সাথ্—" অনাদির আরও কাছ ঘেঁষে আসে প্রথমটী।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায় অনাদি। এখানে রোদ আছে, আছে বাতাস আর অনেক আলো! ঘামে ভিজে ওঠা শরীরটায় হাওয়া লাগছে, হাওয়া লাগছে তেতে ওঠা মাথায়। আবার যেন সে তাজা হয়ে উঠছে। অপর বাচ্চা সিপাইটী অনাদির

পাশে এসে বললে, "আপ্‌কো কোই চীজ্‌কা জরুরৎ হ্যায় তো বলিয়ে, হাম্ লা দেগা—"

বুকের মধ্যে অনাদির শির্‌শির্ করে ওঠে। ঠিক ওই ঘামে ভিজে ওঠা শরীরে হাওয়া লাগার মতই তার থেঁতলে গুঁড়িয়ে যাওয়া মনে যেন কোমল একটা স্পর্শ অনুভব করছে।. এই পুলিশী রাজত্বের মধ্যেও তাহলে মানুষ আছে! আছে তাজা মন! হেমবাবুর মত মানুষকে তারা খেলনা মনে করে না! ইচ্ছে করে অনাদির তার পাশে পাশে গা ঘেঁষে চলা সিপাইটীর একটী হাত সে চেপে ধরে তার দুটী হাতের মধ্যে। পকেট থেকে পয়সা বার করে অনাদি বললে, "পান লিয়াও তিনঠো—" তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করে, "তুম্‌লোগ্‌ খায়গা তো?"

মুখটা কাঁচুমাচু করে সিপাইটী বলে ওঠে, "নহি বাবু বখশিষ নহি মাঙতা—"

ঝট্ করে অনাদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, "তব্‌ দোস্তালি তো জরুর মাঙতা?"

করুণ হয়ে ওঠে বাচ্চা সিপাইটীর মুখখানা. চোখ দুটোও বুঝিবা সজল হয়ে উঠেছে তার। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে অনাদির মুখের পানে অপলক নেত্রে। প্রথম সিপাইটী ধমক দিয়ে ওঠে, "হেই রামশরণ, জলদি যা—"

রামশরণ শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে খানিকটা দৌড়ে যায়, তারপর হন্‌হন্ করে হাঁটতে থাকে। অনাদি তার পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করে, "তুম্‌রা নাম ক্যা?"

"হামারা নাম? বৈজনাথ।"

ওরা এসে পড়েছে একটা হাউজের সামনে। কলতলার চেহারা দেখে অনাদি বুঝতে পারে, বেলা বারোটার জলও চলে গেছে। তাহলে বাজল কটা? জীবনে যেন এই প্রথম অনাদি একটা দিনের এতখানি

সময় কাটিয়ে দিলে ঘড়ি না দেখে। সময়ের সঙ্গে আজ যেন তার জীবনের কোন যোগাযোগ নেই! চৌবাচ্চার পাড়ের ওপর বসে পড়ল অনাদি।

বৈজনাথ এধার ওধার ঘুরে যুদ্ধের আমলের একটা ফলের টিন এনে অনাদির পাশে রাখল। অনাদি চুপচাপ বসে থাকে, তার তো কোন তাড়া নেই আজ, সময় আজ তার এক্তিয়ারের বাইরে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বৈজনাথ অনাদির কাছে এসে বললে, "থোড়া জলদি জলদি কাম্ খতম্ করো বাবু—নহিতো, কোই সাব দেখেগা তো হামারা পর্ বহুৎ তন্ করেগা।"

ঝট্ করে অনাদি উঠে দাঁড়ায়। ঠিকই তো, এ কথা তো তার মনে হয়নি। বৈজনাথ একজন পুলিশ হলেও সর্বেসর্বা নয়! ওর ওপর আছে খবরদারি করার লোক, তার ওপর আছে পাহারাদারি করার লোক, তারও ওপর আছে হুকুম জারি করার লোক! এমনি করেই রয়েছে একের ওপর এক, তার ওপর আর এক! ওই তো ক্ষিতিশবাবু, অবনীবাবু, খগেনবাবু, হেমবাবু, সকলেই বললেন, 'আমরা কি করব মশাই, যেমন যেমন হুকুম পাচ্ছি, তেমন তেমন কাজ করছি—আমরা হচ্ছি হুকুমের চাকর।' এই একই কথা অনাদি তার অফিসেও শুনেছে। সকলেই অসহায়, কারও কোন ক্ষমতা নেই, সকলেই হুকুমের চাকর! তাহলে সর্বেসর্বাটা কে? কে দেশশুদ্ধ মানুষকে হুকুমের চাকর বানিয়ে আড়ালে বসে কলকাঠি টিপছে!

আবার যেন অনাদির মাথাটা টন্‌টন্ করে ওঠে। এত কথা এমন করে ভাববার অভ্যাস তার কোনদিনই নেই। কিন্তু কি যে আজ হয়েছে! কেবলই সে প্রতিটী খুঁটিনাটি ব্যাপারের গোড়ায় পৌঁছবার চেষ্টা করছে। হড়বড়িয়ে কয়েক টিন জল সে ঢেলে দিলে মাথার ওপর—ডান হাতে জল ঢালে আর বাঁহাতে মাথার তালু চাপড়াতে থাকে।

মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মনে মনে ঠিক করে অনাদি, যত সব আজেবাজে আজগুবি চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে—ঠিক ওই রসময়বাবু, কেষ্টবাবুর মতন, সব কথাকেই খুঁটে খুঁটে পোকা বাছার মত! শেষে কি সে পাগল হয়ে যাবে!

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আবার ফিরে আসে অনাদি লক্-আপ্ রুমে। আঙুলের ডগা চালিয়ে চুলটা যথাসম্ভব ঠিক করে নেয়। একটা একটা করে দুটো কানই ভিজে রুমালে চেপে ধরে, ঘাড়টায় জড়িয়ে দেয় রুমালটা। পা গুটিয়ে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে আরাম করে। এতক্ষণে অনাদির শরীরটা বেশ ভাল লাগছে। রামশরণ ফিরে এসেছে পান নিয়ে। বৈজনাথ আর রামশরণ দুজনই বসে আছে মেঝের ওপর তার মুখের দিকে চেয়ে। চোদ্দ থেকে ষোলর মধ্যেই হবে দুজনের বয়েস। হয়তো একই গ্রামের ছেলে! কচি কচি মুখগুলোর দিকে চেয়ে অনাদির বুকটা টনটনিয়ে ওঠে, আহা এরা কিনা হল পুলিশ!

পানের মোড়কটা খুলে অনাদি একটা পান এগিয়ে ধরে রামশরণের দিকে। রামশরণ মুখটা কাঁচুমাচু করে বারান্তরে অনাদি আর বৈজনাথের দিকে তাকায়। বৈজনাথ সাহস দেয়, "লে লেও, উসমে ক্যা—"

আর এক খিলি পান বৈজনাথকে দিয়ে অনাদি বৈজনাথকে জিজ্ঞেস করে, "এত্না বাচ্চা ওমর্মে কেঁয়া পুলিশকা কাম্মে ভর্তি হুয়া?"

"ক্যা করেগা বাবু—" সরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে ষাট বছরের বৃদ্ধের মত বৈজনাথ বলে ওঠে। তারপর বলে যায় একে একে তাদের জীবনের ইতিহাস। মাঝে মাঝে যোগ দেয় রামশরণ। দুজনেরই এক কাহিনী।

গ্রামে তারা থাকত। ক্ষেতিবাড়ীতে আনাজ তেমন আর হয় না। যা-ও যা কিছু হয়, দিতে হয় জমিদারকে। সংসারে অনাটন। বড়ভাই

মজদুরী করতে শহরে চলে এসেছে তিন সাল আগে। নোক্‌রী তার মাঝে মাঝে হয়, আবার ছুটেও যায়। ঘরে টাকা সে ভেজতেই পারেনা। কাজেই তারাও দেশছাড়া হওয়ার কথা ভাবছিল। এমন সময়ে ট্রেণিঙের হাবিলদার সাহেব যান গ্রামে। পাশের গ্রামের আদমী তিনি। অগল্ বগল্ দু'তিনটী গ্রামের পনেরোজনকে এনেছেন তিনি নোকরী দেবেন বলে। এখন তারা ট্রেণিঙে আছে। তংখা বহুৎ কম। কোন রকমে নিজেদের খানাপিনা গুজরাণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘরে রূপেয়া ভেজতে পারছে না। টানাটানি এতটা হত না, যদি না হাবিল-দার সাহেবকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে হত। তা আর উপায় কি! ছ'টী মাস এভাবে দিয়ে যেতে হবে। ট্রেণিং পাশ করার সময় দিতে হবে পনেরো টাকা। তক্‌লিফ্ আরও কিছুদিন করতে হবে। তারপর, পুরা সিপাই যখন তারা হতে পারবে, তখন পুরা তংখাও মিলবে আর উপরিও থোড়াকুছ পাওয়া যাবে। ঘরে তখন তারা অনেক টাকা পাঠাবে, জমিন খরিদ করবে দেশে—ঘরে আর কোন দুখ্ থাকবে না।

বৈজনাথ আর রামশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে অনাদি শুনছিল। আবার সেই রিসেপ্‌শন্ রুম, হরিশ, হেমবাবু, কেষ্টা, খাবার, ফিফটী পার্সেণ্ট—সব কিছু মিলে মিশে যেন জট্ পাকিয়ে যায়। বৈজনাথ তখন বলে চলেছে, "পুরা সিপাই হোনেকে বাদ ইধরউধরসে উপরি তো থোড়াকুছ জরুর মিলেগা—উসিসে বহুৎ রূপেয়া ঘর ভেজেগা—"

আচমকা অনাদি আঁতকে ওঠে, এই কি এদের ট্রেণিং! মানুষের ওপর জুলুম করে উপ্‌রি আদায় করা কি আইন ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য অঙ্গ! এই ব্যবস্থাকেই বজায় রাখার জন্যে কি সরকার এদের প্রয়োজন মিটবার মত মাইনে দেয় না! এমন একটা ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখা—এটাইবা কার হুকুম?

রামশরণ কিছু বলার জন্যে যেন উস্‌খুস্‌ করে ওঠে। পানের পিক্ ফেলার ভান করে উঠে গিয়ে বাইরেটা একবার দেখে আসে। তক্তাপোষের আরও খানিকটা কাছ ঘেঁষে এসে অনাদিকে প্রশ্ন করে, "বাবু, আপ্‌ কম্যুনিষ্ট হ্যায় ?"

চমকে ওঠে অনাদি, লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। গলার কাছটা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে, মাথা নিচু হয়ে ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। কানের গোড়ায় বেজে চলে একের পর এক তার পাড়ার বিড়িওয়ালার মন্তব্য, 'কম্যুনিষ্ট আছে তো কি হয়েছে ! বাবু বড় ভাল লোক আছে—আমাকেও 'আপনি' বলে। মানুষকে ওরা ইজ্জৎ দেয়।' আর হেমবাবুর হুকুমে তার কব্জি চেপে ধরা সিপাইটীর আশ্বাসবাণী, 'ডরো মৎ বাবু—কম্যুনিষ্টলোক কভ্‌ভি ঘাবড়াতা নহি !'

বৈজনাথ মাঝখান থেকে বিজ্ঞের মত বলে ওঠে, "ইয়ে বাত পুছনেকা ক্যা হ্যায় ! ইয়ে তো দেখ্‌নেসেই মালুম পড়তা।"

সত্যি কথা বলার সৎসাহস সঞ্চয় করার জন্যে অনাদি নানান যুক্তি খাড়া করতে থাকে। এমনও তো হতে পারে, ওই কেষ্টার মত এরাও হেমবাবুর চর ! তার মুখ থেকে 'সে কমিউনিষ্ট' এই কথাটা শুনেই কেষ্টার মত লাফাতে লাফাতে গিয়ে হেমবাবুকে বলে আসবে। মাথা তুলে অনাদি সোজাসুজি চায় রামশরণের চোখের ওপর। হঠাৎ যেন অনাদির চোখে ধাঁধা লাগে, মনে হয় সুজিত আর অজিত যেন গল্প শোনার আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। যে কথাটা সত্যি, সেইটাই অনাদির কাছে এই মুহূর্তে মারাত্মক মিথ্যে হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত অতীতকে অতিক্রম করে অনাদি বললে, "হুজুর্‌, ম্যায় কমিউনিষ্ট হুঁ।"

বিজ্ঞের দৃষ্টিতে বৈজনাথ রামশরণের দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু রামশরণ পড়ে যায় মহা ভাবনায়। হঠাৎ বালকের মতই অনর্গল প্রশ্ন

করে যায়, তবে তোমাকে কেন ধরে এনেছে? তোমরা তো খারাব আদমী নও! আরও বহুৎ কমুনিষ্ট আমরা দেখেছি, তারাও বহুৎ আচ্ছা আদমী! তবে কেন হাবিলদার সাহেব বলেন, কমুনিষ্টলোক বহুৎ খতরনাক্ আদমী?'

অনাদি প্রতিটী প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে। রসময়বাবু, কেষ্টবাবু, হারেশ আর তার নিজের জীবনের সংগ্রামকে মন্থন করে বেরিয়ে আসে নতুন এক মানুষ। রসময়বাবু আজ যেন তার মধ্যে নতুন করে সঞ্চারিত হতে থাকেন। তার জীবন আর এই রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ অনাদি যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছে, তার জীবনের ব্যর্থতার মূল কোথায়! কোথায় লুকিয়ে আছে সেই কারণ যার ফলে বৈজনাথ আর রামশরণ আজ কৈশোরের সীমা অতিক্রম করার আগেই সমাজের বুকে কুৎসিত এক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে।

অসীম উৎসাহে অনাদি বলে চলেছে আর অপার বিস্ময়ে হাঁ করে শুনছে সুদূর বিহারের কোন এক গণ্ডগ্রামের দুটী কৃষক সন্তান সেই শক্তির কথা, যে শক্তি নেবে প্রতিটী মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব, দেবে প্রতিটী মানুষকে সমান অধিকার।

লক্-আপ্ রুমের বাইরে থেকে ভেসে আসে হেমবাবুর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, "কই অনাদিবাবু—আসুন—"

মুহূর্তের মধ্যে বৈজনাথ লাফিয়ে উঠে দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়ে আর রামশরণ হতভম্ব হয়ে তাকায় অনাদির মুখের দিকে তারপর দরজার বাইরে।

তেরো

লক্-আপ্ রুম্ থেকে বেরিয়ে এসে অনাদি হেমবাবুকে জিজ্ঞেস করলে, "এবার কোথায় যেতে হবে ?"

হেমবাবু বললেন, "এই তো পাশের বাড়ীটায়—আই, বি, ডিপার্টমেণ্ট। ভয়ের কিছু নেই অনাদিবাবু, সে সব দিনকাল আর নেই। জানেন, বৃটীশ আমলের টর্‌চার্ রুম্‌টা এখন হয়েছে ক্যান্‌টীন্।"

"তাই নাকি !" বিস্মিত হয়ে অনাদি হেমবাবুর মুখের দিকে চায়।

হেমবাবু অনাদিকে তার পরবর্তি কার্যসূচী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে যান, "আই, বি, ইন্সপেক্টর আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। যা আপনি জানেন খোলাখুলি বলে যাবেন। কিন্তু, দয়া করে চটবেন না—কেস্‌টা আপনার খুবই সিম্পল্।"

পুরণো বাড়ীটা পার হয়ে নতুন একটা বাড়ীর চাতালে এসে উঠলেন হেমবাবু। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান হাতে ক্যান্‌টীন্ আর বাঁ হাতে সারি সারি ঘর—সামনে দিয়ে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। ছোট ছোট ঘরগুলোর একটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমবাবু। ক্যান্‌টীনে অনেক লোক, খানার প্লেট আর কাপ-ডিসের ঝনঝনানি আসছে ভেসে। কে যেন ক্যান্‌টীনের ভেতর থেকে হাঁক পাড়ে হেমবাবুর উদ্দেশে। হেমবাবু অনাদিকে বললেন, "ঘরের মধ্যে গিয়ে বসুন, আই, বি, ইন্সপেক্টর এখনি আসবেন।"

হাত তিনেক চওড়া আর হাত পাঁচেক লম্বা একটী ঘর। ঢুকবার একটী দরজা আর তার অপর দিকে বৃহৎ এক জানলা—মোটা তারের জাল দিয়ে আষ্টেপিষ্টে মোড়া। সহসা অনাদির মনে হয়, এতই যদি এদের জোর—খুশীমাফিক একটা লোকের চাকরী খেতে পারে, তাকে

ধরে আনতে পারে, জেলে পুরতে পারে—তবুও এদের এত ভয় কেন! ঘরে ঢুকবার আগে চাতালটা আর একবার দেখে নেয় অনাদি। হেমবাবুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বৈজনাথ আর রামশরণ। হেমবাবু বললেন, "তাহলে আমি এখন আসি অনাদিবাবু।"

চমকে ওঠে অনাদি, 'আসি' বলে বিদায় নেওয়া! মনে পড়ে তার, দেশ থেকে প্রথমবার কলকাতায় আসবার সময়ে মাকে সে বলেছিল, 'তবে যাই মা।' যে কান্নাকে মা পুত্রের অকল্যাণের আশঙ্কায় সারাদিন চেপে রেখেছিলেন, সেই কান্না আর বাধা মানল না। কান্নায় ভেঙে পড়ে বুকের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'যাই বলতে নেই বাবা, বল্ আসি।' যে কথার সঙ্গে এত মমত্ববোধ, এত আন্তরিকতা রয়েছে জড়িয়ে, সেই কথা হেমবাবু তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন কেমন করে! আরও একবার বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে অনাদি হেমবাবুর মুখের দিকে।

গা ঝাড়া দিয়ে হেমবাবু বৈজনাথ আর রামশরণকে বললেন, "য়েক্ আদমী রহো ইধর, ঔর্ য়েক্ আদমী আও হামারা সাথ্—" স্বাভাবিক হেমবাবু কোঁচাটাকে ঝট্ করে বাঁহাতে তুলে নিয়ে হন্‌হন্ করে চলতে শুরু করে দেন। বৈজনাথ আর রামশরণ দুজনে কিছুক্ষণ করল পরস্পরকে ঠেলাঠেলি, শেষ পর্যন্ত রামশরণেরই হল জিত্। বৈজনাথ অনাদিকে বললে, "হাম্ চলতা বাবু—" অনিচ্ছুক পায়ে বৈজনাথ ধীরে ধীরে চলতে থাকে হেমবাবুর পথ ধরে।

অনাদি ঢুকে পড়তে যায় ঘরের মধ্যে। রামশরণ বললে, "সিগ্রেট লে আয়গা বাবু?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি। ইচ্ছে করে রামশরণের কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নেয়। বুকটা তার টন্‌টনিয়ে ওঠে। মানুষে মানুষে যেখানে রয়েছে এমন মধুর সম্পর্ক, এত আন্তরিকতা, এত

দরদ, সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা কেন ? যে রামশরণ তার দুঃখে এত কাতর, সেই রামশরণই হয়তো আর কিছুক্ষণ পরেই এদের কারও হুকুমে মারবে তার মাথায় ডাণ্ডা ! এমন অদ্ভুত একটা ব্যবস্থা চলছে কেমন করে !

হেসে অনাদি পকেটে হাত পুরে বললে, "নহি, সিগারেট লানে নহি হোগা—বিড়ি হায় হামারা পাস্—"

রামশরণ বললে, "ঠিক হ্যায়, হাম্‌তো ইধরই রহেগা—কুছ্ জরুরৎ হোগা তো হামকো বলিয়ে—" অন্য একটা ঘরের সামনে থেকে খালি একটা টুল টেনে নিয়ে এল সে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনাদি। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটি টেবল আর তার দুপাশে দুটী চেয়ার। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে কাগজের একটা টুকরোও বুঝিবা নেই ! দরজার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অনাদি, ওখান থেকে ক্যান্‌টীনের ভেতরকার অনেকখানি দেখা যায়। ক্যানটীনের বয় খাবার নিয়ে আসছে, টেবলে টেবলে দিচ্ছে, থেকে থেকে অর্ডার হেঁকে উঠছে। অনাদি চেয়ে আছে সেই দিকে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, হেমবাবু বলেছেন, ওই ঘরটাই নাকি আগে ছিল টর্‌চার্ রুম ! তা ভাল, অত্যাচারের বদলে খাওয়ার ব্যবস্থা, এইটাই তো হওয়া উচিত। আরও একটু ঝুঁকে পড়ে ক্যান্‌টীনের মধ্যেটা লক্ষ্য করতে থাকে। লুচি ভাজার গন্ধ আসছে নাকে, ধীরে ধীরে অনাদির পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। সেই কোন সকালে রঞ্জণবাবুর ঘরে খেয়েছিল দু'পিস্ রুটী, তারপর এস্, বি, অফিসের বিখ্যাত ব্রেকফাষ্ট, তারপর হেমবাবুর গরম গরম লুচি, মিষ্টি আর ফল ! কিন্তু লুচি ভাজার গন্ধে ক্ষিধে যে আর বাগ মানছে না ! গা গুলিয়ে উঠছে ! হঠাৎ অনাদি আবার চমকে ওঠে, সোজা হয়ে বসে চেয়ারের ওপর। নতুন দিনের নতুন এই ব্যবস্থার তাৎপর্যও যেন ধরা পড়ে যায়।

টরচার রুমের বদলে ক্যান্টীন্! অসীমদার বৃদ্ধ বাবার পেটে বুটশুদ্ধ লাথি মারার বদলে অবনীবাবু, ক্ষিতিশবাবু, খগেনবাবু, হেমবাবুর অমায়িক ব্যবহারের মতই!

সময় বহে চলেছে, বেলা পড়ে আসছে। থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে উঠছে অনাদি, কোন কাজই সে করল না আজ সারাটা দিন। কিন্তু এখানে তার করবারও তো কিছু নেই! তবুও অভ্যাসের বশে চঞ্চল হয়ে ওঠে বারবার। এমন অনাবিল আলস্যে দিন বোধহয় তার জীবনে আর কোনদিন কাটেনি। মামার বাড়ীতে এমন ফুরসৎ সে কদাচিৎ পেয়েছে, যার ফাঁকে মায়ের কাছে তাঁর মুখের দুটো কথা স্থির হয়ে বসে শোনার অবকাশ পেয়েছে। সেখানে ছিল মামা মামি, এমন কি মামাতো ভাইবোনগুলোরও সতর্ক নজর ছিল তার অবসর সময়টার ওপর। তারপর এসেছে কলকাতায়, এখানে 'মানুষ' হওয়ার তাগিদ তার প্রতিটী মুহূর্তকে করেছে হণ্যের মত তাড়া। কিন্তু এত অবসর, এমনতর অবসরকে নিয়ে সে করবে কি!

অবসরের যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে অনাদি। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ সে এমন ভাবে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে থাকবে! যা হবার তা হয়ে যাক্। সে নিঃসন্দেহে জানুক জীবন পথের কোন মোড়ে এসে সে দাঁড়িয়েছে! মনে পড়ে যায়, বৈজনাথ আর রামশরণের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছে কমিউনিষ্ট বলে। কিন্তু জোর তো সে পাচ্ছে না তার মনে ওই হরিশের মত আর কেষ্টবাবুর মত! রসময়বাবুর মত ধীর স্থির অতলস্পর্শি সে তো হয়ে উঠতে পারছে না!

গোঁফ দাড়ি কামান, চাঁছা ছোলা, ছোকরা মাফিক এক প্রৌঢ় এসে ঢুকলেন ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে অনাদি কাঠ হয়ে উঠল। যেমন ভাবে চেয়ারে বসে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই হেলান দিয়ে সামনের দিকে পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে রইল বসে।

একগাল হেসে যামিনীবাবু বললেন, "কি অনাদিবাবু, খুব অসুবিধে হচ্ছে বোধহয় ?"

এদের এই আত্মীয়তার কথায় মুহূর্তে অনাদির মুখের ওপর রক্তের একটা ছোপ্ ধরে যায়, বিশ্রী কয়েকটা কড়া কথা একেবারে জিভের ডগায় এসে পড়ে। ঝট্ করে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে হাঁটুটা ঠুকে যায় টেবলের পায়ায়। বিশ্বাস করে অনাদি, একটা কাজ সুরু করার মুহূর্তে বাধা পড়লে, সে কাজ আর করা উচিত নয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "নাঃ, তেমন আর কি অসুবিধে! কেবল যা সেই সকাল থেকে ছুটী ভোগ করছি আর হেমবাবুর আতিথেয়তায় খেয়েছি গরম গরম বড় বড় লুচি—"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে যামিনীবাবু বললেন, "যাক্, তাহলে খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধে হয়নি ?"

"নাঃ, কি আর এমন অসুবিধে! আধপেটার বেশী যে আমাদের জোটে না এ খবরতো আপনারা ভালভাবেই জানেন। কাজেই আধপেটা খাইয়েছেন হেমবাবু আর বাকীটা ভরে গেছে আপনাদের ওই ক্যান্টীনের লুচিভাজার গন্ধে—"

অনাদির শ্লেষ গোয়েন্দা পুলিশ হলেও যামিনীবাবুর গায়ে বেঁধে। বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন, "বেশ তো, পেটভরা খাওয়া হয়নি, সে কথাটা সোজাসুজি বললেই তো হয়। তা অত রসিকতার দরকার কি!"

"ওঃ, ওটায় বুঝি আপনাদের একচেটে অধিকার ?" অনাদির কথার মধ্যে হরিশের স্বর ফুটে ওঠে।

টেবলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যামিনীবাবু শাসিয়ে ওঠেন, "দেখুন, বুলি কপ্‌চানর জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়নি—"

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায় অনাদি, "মুখ সামলে কথা বলবেন বলে

দিচ্ছি। সারাটা দিন ধরে একটা মানুষকে নিয়ে খেলা পেয়েছেন, না?" তীব্র ধমকের সুরে অনাদি ফেটে পড়ে।

টেবল থেকে চট্ করে সরে গিয়ে যামিনীবাবু চিৎকার করে ওঠেন, "দরোয়াজা—"

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে যায়—একেবারে যামিনীবাবুর পাশে এসে দাঁড়ায় রামশরণ।

যামিনীবাবুর চাঁছা-ছোলা মুখখানা মুচড়ে দুমড়ে কদাকার হয়ে ওঠে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠেন, "ওঃ, তুমি দেখছি লাথির ঢেঁকি, কিলে ওঠবার পাত্তর নও! ব্যবস্থা করতে হবে নাকি?"

রামশরণের মুখের দিকে চোখ তুলে চায় অনাদি। রামশরণের সেই কচি মুখখানার মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চোখদুটো মিট্‌মিট্ করছে। তবুও রামশরণ যামিনীবাবুরই পাশে—তাঁর হুকুমের অপেক্ষায়। মাথাটা নামিয়ে নেয় অনাদি। সে পরাভূত—সে একা—তার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি! ধীরে ধীরে সে বসে পড়ে চেয়ারের ওপর। অনেকখানি অবসর, অনাদি খুঁজছে তার সমস্ত জীবনটাকে আঁতিপাতি করে। এমন সময় কে দাঁড়াতে পারে তার পাশে! চিণু? জীবনের একই সংগ্রামে এখনও গড়ে ওঠেনি সাথিত্ব চিণুর সঙ্গে! তবে! কেষ্টবাবু দিয়েছিলেন পড়তে 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে'। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জুলিয়াস্ ফুচিক! নাৎসি গোয়েন্দা বিভাগের হাতে বন্দী হিটলারী নির্যাতনের যাঁতাকলে চলেছে নিষ্পেষণ! তবুও ফুচিক অটল, অনড়! কিসের আশায়? আবার তাঁর দেশের মানুষ বাঁচবে, হাসবে—শিশুরা করবে খেলা ফুটন্ত ফুলের মত। দুনিয়ার বুকে সত্যই হবে জয়ী।

মুখ তুলে চাইলে অনাদি যামিনীবাবুর দিকে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে যামিনীবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, "এই কি আপনাদের পার্টি-লাইন নাকি?"

অনাদি নিরব।

"আপনাদের পলিট্ ব্যুরো থেকে নির্দেশ বেরিয়েছে, জেলে থানায় হাজতে রাস্তায় ঘাটে মাঠে ময়দানে সর্বত্র অরাজকতা সৃষ্টি করতে, গভর্ণমেন্টকে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য করতে। এ সার্কুলার আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?"

যামিনীবাবুর চোখের ওপর আলগাভাবে চোখটা রেখে অনাদি বললে, "আমি বাথরুমে যেতে চাই—"

"সে না হয় যাবেন, কিন্তু আমার কথার জবাব দিন—" ধমক দিয়ে ওঠেন যামিনীবাবু।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে ধরেছে অনাদি, চোখ নামিয়ে নিয়েছে মাটীর দিকে। ওই লোকটার মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না, কেমন যেন হিংস্রতা জেগে উঠছে মনে। হাতদুটোকে প্রাণপণে মুঠো করে অতি ধীরে ধীরে অনাদি বললে, "আমি বাথরুমে যাব—"

যামিনীবাবুর চমক ভাঙে, তাচ্ছিল্যভরে হেসে ওঠেন, "ওঃ, চোঁক গিলে নিলেন বুঝি! ভোল্ পাল্টে ফেললেন? আপনারা তো মশাই দেখছি পাকা বহুরূপি!"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে, "আমি বাথ্রুমে যাচ্ছি—"

যামিনীবাবু রামশরণকে ইশারা করে বললেন, "বাবুকো বাথ্রুমমে লে যাও—"

চাতালে বেরিয়ে অনাদি হন্হন্ করে হাঁটতে থাকে। সমস্ত মনটা যেন তড়বড়িয়ে উঠেছে, আর যেন সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। বাথরুমের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি, ধীরে ধীরে আপনা হতেই হাতদুটো উঠে যায় চুলের গুচ্ছের মধ্যে, তারপর আঙুলগুলো বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হয় মুঠিভরা চুল সমেত। বাথরুমে আসতে চেয়েছিল

অনাদি, একবার আকাশের দিকে চাইবে বলে আর গাছের মাথায় মাথায় রোদের ঝল্‌মলানি দেখবে বলে।

রামশরণ এসে দাঁড়ায় অনাদির পাশে। ঝট্‌ করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকায় রামশরণের দিকে—তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারেক চোখ বুলিয়ে নেয়। আর যেন রামশরণের কিশোর মুখের সরলতা স্পর্শ করছে না তার মনকে। ও সরলতার মূল্য কতখানি! এখনই তো এই রামশরণ তার গর্দান চেপে ধরত যামিনীবাবুর হুকুমে!

রামশরণ মুখটা আরও খানিকটা এগিয়ে এনে চাপা গলায় বললে, "গোঁসা মত্‌ হও বাবু—"

অনাদির ঠোঁটের কোণ মুচকে ওঠে, তাই ঠিক—রাগ না করাই সমিচীন! এরা তাকে দুপায়ে থেঁতলে, মাড়িয়ে, গুঁড়িয়ে দিক—আর সে তখন ঈশ্বরের কাছে এদের কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করুক! হঠাৎ মনে পড়ে যায় রসময়বাবুর কথা, 'অনেক লড়াই, অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের প্রয়োজন আছে অনাদিবাবু,' আরও বলেছিলেন রসময়বাবু দুনিয়াজোড়া মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে! হ্যাঁ, ফুচিকও ধৈর্য হারাননি, নিরবে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে গেছেন, কিন্তু একটা সহকর্মিরও নাম তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়নি। নিজের জীবন দিয়ে তিনি চেকোস্লোভাকিয়াকে বাঁচিয়ে গেছেন।

রামশরণ বললে, "চলিয়ে বাবু, বহৎ টাইম্‌ হো গয়া—"

ঝট্‌ করে অনাদি বলে বসে, "হাম আভি নহি যায়গা—আধাঘণ্টা বাদ যায়গা।"

রামশরণের মুখখানা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, "ক্যা ফায়দা বাবু! হাম হ্যায় ডিউটীপর্‌, ইয়ে বাত্‌ আভ্‌ভি রিপুর্ট করনে পড়েগা। সাথই সাথ্‌ ঔর্‌ দো'চার সিপাই আকে আপকো পকড় লে যায়গা—খামখা আপকো পর্‌ জুলুম হোগা। আপ্‌ হ্যায়

ইধর্ একেলা আদমী, আপতো আপনা ওয়াদা পূরা করণে নহি সেকোগে।"

কেমন যেন অদ্ভুত লাগে অনাদির, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ রামশরণের মুখের দিকে। একলা সে কিছুই করতে পারেনা! না, না, পারেও নি সে কিছু করতে। স্বাবলম্বি হওয়ার জন্যে প্রাণপণ কৃচ্ছ্রসাধন করেও সে দাঁড়াতে পারেনি নিজের পায়ের ওপর। একা একা দাঁড়াতে গিয়ে বারবার মাটী সরে গেছে তার পায়ের তলা থেকে!

আঁচলা ভরে খানিকটা জল চোখে মুখে মাথায় দিয়ে আবার ফিরে আসে অনাদি সেই খুপরিটার মধ্যে। টেবলের ওপর থেকে পা গুটিয়ে নিয়ে যামিনীবাবু বিপুল অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন, আসুন অনাদিবাবু, বসুন, একটু আরাম করে বসুন। মাথায় জল দিয়ে এলেন বুঝি? তা বেশ করেছেন। মাথাটা এবার ঠাণ্ডা হয়েছে, এবার ভালভাবে কথাবার্তা কইতে পারবেন। বুঝলেন না, মেজাজ দেখিয়ে এখানে কোন সুবিধে করতে পারবেন না।"

চোখ তুলে অনাদি যামিনীবাবুর মুখের ওপর রাখে। যামিনীবাবু সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলেন, "আসুন, একটা সিগারেট খান। আজ আর কোন কাজ করব না, আপনি একটু বিশ্রাম নিন। আছেন তো এখন দিন কতক—"

সিগারেট না নিয়ে অনাদি নিজের পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে ধরিয়ে হাল্কাভাবে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে কিছুদিন যে এখানে আছি, এটা স্থির হয়ে গেছে?"

"স্থির হওয়ার আর আছে কি! যেমন কেস্ তেমন ব্যবস্থা। সবই আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনার উত্তর যদি স্যাটিশফ্যাক্টরী হয়, তাহলে হয়তো কালই ছাড়া পেয়ে যেতে পারেন—"

এ কথাটা নতুন নয়, অনেকবার শুনেছে অনাদি সেই সকাল থেকে। আর যেন প্রবৃত্তি হয়না কথা বাড়াতে। জানলা দিয়ে বাইরে টেনিস্ লন্টার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে অনেক-খানি। গাছপালার ছায়াগুলো আরও লম্বিত হয়ে লনটাকে জুড়ে ফেলেছে, দুটো বাড়ীর মাঝখান দিয়ে খানিকটা রোদ্দুর টেরচাভাবে পড়েছে মাঠটার কোণাকুণি। কেমন যেন এক শুব্ধতা অনাদির মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় বুঝিবা গ্রামের মধ্যাহ্ন।

যামিনীবাবু তখনও অনর্গল বকে চলেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর ক্রমশই মিহি আর মোলায়েম হয়ে আসছে। তখন তিনি অনাদিকে বুঝিয়ে চলেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর পুলিশবিভাগের হৃদয় পরিবর্তনের কথা। আর অনাদির মন তখন গিয়ে পড়েছে তার গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে। বিড়িটা আঙুলের ফাঁকে কখন নিভে গেছে, চোখদুটো হয়ে গেছে স্থির, মুখের ওপর ঘনিয়ে উঠেছে শান্ত সুকুমার ছায়া।

"বুঝলেন অনাদিবাবু—" যামিনীবাবুর কণ্ঠে তার নামটা উচ্চারিত হতে শুনে অনাদি চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে আনে ঘরের মধ্যে। সোৎসাহে যামিনীবাবু বলে যান, "আমাদের যদি আপনি শত্রু মনে করেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন। আমরা আপনাকে ধরে এনে খামখা খানিকটা হয়রাণ করতে চাই না। আপনাকে আমরা সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

মুখ যেন অনাদির আপনা হতেই খুলে যায়, "আমাকে ধরে নিয়ে এলেন কি সাহায্য করবার জন্যে নাকি!"

টেবলের ওপর হাত দুটো রেখে, সামনে আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে অন্তরঙ্গতায় গদগদ হয়ে উঠে যামিনীবাবু বললেন, "ঠাট্টার কথা নয় অনাদিবাবু, একটা কথা আপনাকে গোড়ায়ই বুঝতে হবে। ভারতের শাসনভার এখন দেশের নেতাদের হাতে। কাজেই এমন কোন

কাজ তাঁরা করতেই পারেন না, যাতে জনসাধারণের কোন রকম অসুবিধে হয়। তবুও আমরা আপনাকে ধরে এনেছি। তাহলে ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা কি।"

অনাদির মধ্যে আবার উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এদের ভাল কথা, সহৃদয় কথা আর সহানুভূতি যেন তার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিচ্ছে। বিরক্তি যথাসম্ভব চেপে রেখে অনাদি বললে, "আহা, আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা কি, তাই বলুন না ?"

যামিনীবাবুর স্বর হঠাৎ যেন খাদে নেমে যায়, "এর আগে আপনার একবার চাকরী গিয়েছিল—কেন ?"

ঠিক যেন ধরতে পারছে না অনাদি, এ প্রশ্নের জের কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে থাকে যামিনীবাবুর মুখের দিকে।

"বলুন—" স্বর চড়ছে, হুকুমের আমেজ লেগেছে যামিনীবাবুর কণ্ঠস্বরে।

আমতা আমতা করে অনাদি বললে, "সে তো বৃটীশ আমলে!"

"আপনি ছিলেন একজন টেররিষ্ট ?"

জোর দিয়ে অনাদি বলে, "সে কথা এখন ওঠে না—"

"ওঠে, চিরদিনই উঠবে আর এখনই উঠেছে। তারপর চাকরী ফিরে পাওয়ার জন্যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিশে আপনি আন্দোলন করেছিলেন।"

"কোন কমিউনিষ্টকে আমি চিনি না।"

চট্ করে স্বরের পর্দা চড়ে যায় একেবারে সপ্তমে, "আপনাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী কে ?"

"রসময় সেন।"

"রসময়বাবু যে একজন কমিউনিষ্ট, এ খবর আপনি জানেন ?"

"না।"

"নিশ্চয় জানেন। তিনি এখন কোথায় আছেন?"

"জানি না।"

"আপনি ওই ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা আর আপনি জানেন না?"

"ইউনিয়নের আমি কোন কাজই করি না।"

হন্‌হন্ করে কেষ্টা এসে ঢুকল ঘরে। কাগজের একটা মোড়ক অনাদির হাতে দিয়ে বললে, "দু'পিস্ আছে—হেমবাবু এক পিস্ বেশী দিতে বলে দিয়েছেন—" চটা-ওঠা সকালের সেই কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললে, "ঝট্‌পট্ খেয়ে নিন, আমাকে আবার এখুনি লক্-আপ্-এ চা দিতে হবে—" যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল তেমনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেল বেরিয়ে।

মোড়কটা খুলে রুটীর পিস্ দুটো বার করে অনাদি হেসে ফেললে। যামিনীবাবু ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি, হাসলেন যে?"

রুটীর পিস্ দু'টো আঙুলের ডগায় তুলে ধরে বললে, "এইটাই ছিল সকালে এক পিস্—"

যামিনীবাবু ও-ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে, উঠে দাঁড়িয়ে আড়া-মোড়া ভেঙে বললেন, "বসুন আপনি, কাল আবার দেখা হবে—" ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্যানটীনে।

অনাদি ধীরে ধীরে একটা একটা কামড় দেয় দু'পিস্ পাঁউরুটীতে একই সঙ্গে আর ভাবে, তাহলে স্বাধীনতা এসে পরিবর্তনটা হল কোথায়! সকালের এক পিস্ রুটী বিকেলে দু'পিস্ হয়ে যাওয়ার মত!

চোদ্দ

বেশ লাগছিল অনাদির একা একা। ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই, এমন কি একটা ঝিঁঝিঁ পোকারও নয়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় এস্, বি, অফিসে ঢোকার সময়ে পুরণো বাড়ীটাকে দেখে তার মনে পড়েছিল তারই গ্রামের জমিদার জনার্দন রায়ের 'খুনে বাড়ী'র কথা। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য ওই দুটো বাড়ীর মধ্যে! কিন্তু এ বাড়ীটা নতুন, এখানে নেই দাঁত বের করা ইঁট, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক! নূতনত্বে ঝকঝক্ তকতক্ করছে। হ্যাঁ, জনার্দন রায়ও এখন নতুন মানুষ! আর তিনি গ্রামে থাকেন না, এখন শহরের পাকা বাসিন্দা—আর কংগ্রেসী এম্, এল্, এ!

চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিলে অনাদি জানলাটার মুখোমুখি, যাতে টেনিস্ লনটা থাকে চোখের ওপর। সামনেই দেখা যাচ্ছে জামগাছটা, থোকা থোকা সাদা সাদা জামরুল্ যেন মুক্তোর মত চকচক্ করছে। মনটা কেমন যেন দুঃখিত হয়ে ওঠে জামগাছটার জন্যে। কত্তই না নিষ্প্রাণ ওর ফলন, একটীও বালক বোধহয় ওর ধারেকাছে ঘেঁষেনি ওর মুকুল ফোটার দিন থেকে।

সারাটা দিনের মধ্যে এতক্ষণে অনাদির মনে হচ্ছে, এইবার যেন সে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। সারাটা দিন ধরে নানান ভাবনার টানা-পোড়েনে যেন সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। যামিনীবাবু সমস্ত উদ্বেগের অবসান করে দিয়েছেন। তার মেয়াদ এখন সাত দিনও হতে পারে, আবার ন'মাসও হতে পারে! সাতদিন আর ন'মাস যেন উনিশ আর বিশ!

ভারি শান্তি লাগছে মনটায়। থেকে থেকে জানলা দিয়ে খানিকটা করে বাতাস ঢুকে পড়ছে ঘরে আর ঘুমে যেন অনাদির চোখদুটো আসছে ঢুলে। এমনই শান্তির আর একটা ছবি ভেসে উঠছে তার

চোখের ওপর। তার বাবার তখন শেষ অবস্থা, বাড়ীময় চলেছে একটা হৈ হট্টগোল। ডাক্তারবাবু আসছেন বার বার; আসছেন পাড়ার প্রবীণেরা; খিড়কি দরজা দিয়ে এক-গলা ঘোমটা দিয়ে অন্য বাড়ীর খুড়িমা জেঠিমারা। থেকে থেকে মা ডুক্‌রে কেঁদে উঠছেন, আবার তখনই আঁচলে মুখ চেপে ধরে কান্না গিলে ফেলছেন। তারপর ডাক্তারবাবু বাবার নাড়ি টিপে থাকা হাতটা ধীরে ধীরে দিলেন নামিয়ে, বাবার গায়ের চাদরটা টেনে মুখটা দিলেন ঢেকে, ওষুধের ব্যাগটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে গেলেন বেরিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটা জুড়ে একটা গোঙানি উঠে মাঝপথেই গেল থেমে। মা পাষাণ মূর্তির মত দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রইলেন বসে। আর কোন কোলাহল নেই, গুঞ্জণ নেই, নেই কোন উদ্বেগ!

অনাদির মনে হয়; এ যেন মৃত্যুর শান্তি! ঠিক তাই। এর পর বেঁচে থাকারই বা সার্থকতা কি! চাকরী গেল, বেকার হয়ে চোরের মতন অনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ান, চাকরীর উমেদারী করতে গিয়ে পদে পদে অপমান, টিউশনি করতে গিয়ে ছাত্রের অভিভাবক থেকে ছাত্র পর্যন্ত সকলের করুণা—আর না। আর না ঠোঙা বানান—ও দিয়ে বাঁচা যাবে না। মা, সুজিত আর অজিত? ওদের দায়ীত্ব বহন করার মুচলেকা লিখে সে জন্মগ্রহণ করেনি! একটা মানুষের স্কন্ধে ভর করে যেখানে এতগুলো জীবন—সেখানে কেউ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না! বাবার মৃত্যুর পর নিজের ভিটেমাটী ছেড়ে মা কি বেঁচে আছেন? সুজিত আর অজিত কি বাঁচার মত রসদ পাচ্ছে? না সে নিজে বাঁচার রাস্তা পেয়েছে?

ঝপ্‌ করে দাঁড়িয়ে উঠে অনাদি আঁতিপাঁতি করে খোঁজে সমস্ত দেয়ালটা, লক্ষ্য করে কড়িকাঠের উচ্চতা। থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর—মাথা টলছে, পা টলছে। লম্বা একটা ধাপ নিয়ে এগিয়ে

গিয়ে অনাদি জানলার দুটো গরাদ দু'হাতে প্রাণপণে চেপে ধরে। মাথাটাকে দুটো গরাদের মধ্যে চেপে ধরে চোখ বুজোয়, না-না, মরতে সে চায়না!

রসময়বাবুর খোঁজ নেওয়া তাকে ধরে আনার উদ্দেশ্য। কানা-ঘুষোয় সে শুনেছে, রসময়বাবু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। সেই খবরটী যামিনীবাবু তার কাছে পেতে চান। এইটাই হবে তাঁর কাছে স্যাটিশফ্যাক্টরী উত্তর! কিন্তু কে জানে রসময়বাবুর পাত্তা? বীরেনবাবু! হতেও পারে। কিছুদিন আগে বেআইনী কমিউনিষ্ট পার্টির একখানা ইশ্‌তেহার তার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন সবার অলক্ষ্যে! কিন্তু, বীরেনবাবু! নিতান্ত গোবেচারী! তাহলে ওঁকেও টেনে নিয়ে আসবে? কিন্তু চাকরীটা তো তার বাঁচবে। এ খবরটা নিশ্চয়ই এঁদের কাছে স্যাটিশফ্যাক্টরী হবে! স্যাটিশফ্যাক্টরী কথাটা যেন গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে অনাদির কানের গোড়ায়। স্যাটিশফ্যাক্টরী উত্তর দিলে সরকার তাকে নেকনজরে দেখবে। কেবল যা ধরা পড়বেন বীরেনবাবু আর রসময়বাবুও হয়তো! কিন্তু সে তো বাঁচতে পারবে। পারবে কি? বাঁচতে তো পারেনি নরেন গোঁসাই। নরেন গোঁসাই! চোখ দুটো অনাদির স্থির হয়ে যায়, জ্বালা করে ওঠে, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—

ছুটে যায় অনাদি দরজাটার পানে। হ্যাঁ, ছুটে সে বেরিয়ে পড়বে যেখানে আরও অনেক মানুষ আছে। একা একা থাকলেই তাকে পেয়ে বসবে যত কদর্য চিন্তা—আত্মহত্যা থেকে বিশ্বাসঘাতকতা! এক হেঁচকায় দরজাটা খুলে ফেলে অনাদি, একেবারে চাতালের ওপর এসে দাঁড়ায়, উত্তেজনায় সে হাঁপাতে থাকে।

রামশরণ উঠে দাঁড়ায় তার টুলটা ছেড়ে, "ক্যা বাবু, কুছ্‌ মাঙতা হায়?"

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে অনাদি রামশরণের কচি মুখখানার

দিকে। মনে পড়ে যায়, আর কিছুক্ষণ আগে সে ওরই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'জরুর, ম্যায় কমিউনিষ্ট হুঁ।' মাথাটা তার লজ্জায়, সঙ্কোচে ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। হেমবাবুকে ওয়ার্ণিং দেওয়ার সময়ে হরিশের মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। হরিশ উদ্যত রাইফেলের মুখে বুক পেতে দিতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না। আরও মনে হয়, জুলিয়াস্ ফুচিক সম্পূর্ণ সজ্ঞানে নিজের জীবনকে জবাই হতে দিতে পারেন হিটলারী অত্যাচারের কশাইখানায়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। না, না, পারেন না ওঁরা কেউই, রসময়বাবু, কেষ্টবাবু, হরিশ, ফুচিক্, কেউই না।

রামশরণ আবার বলে, "ক্যা বাবু, তবিয়ৎ খারাব্ লাগতা?" মুখখানা ঝুঁকিয়ে আনে অনাদির মুখের কাছে।

ধীরে ধীরে মাথা তোলে অনাদি। ইচ্ছে হয়, রামশরণের কাঁধে একটা হাত রেখে ডেকে নিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। তারপর ওর কাছে খোলাখুলি স্বীকার করে, না কমিউনিষ্ট সে নয়—তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে সে।

কিন্তু ডাকা আর হলনা অনাদির রামশরণকে। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে দুপ্ দাপ্ করে নেমে আসছেন হেমবাবু একখানা ফাইল বগলে। অনাদির সামনে এসে বললেন, "ওঃ আপনার কাজ হয়ে গেছে? বেশ, আপনি গিয়ে লক্-আপ্ য়ে বসুন—" ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, "আর পাঁচটাতো প্রায় বাজল, এইবার আপনাকে রেখে আসব—"কোঁচাটাকে পট্ করে ঝেড়ে নিয়ে হন্‌হন্ করে তিনি চলে যান।

অনাদি রামশরণকে বললে, "চলো তব্ লক্-আপ'মে—" এবার অনাদি চলে আগে আগে, এখানকার পথঘাট তার চেনা হয়ে গেছে। গভীর একটা প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলেছে অনাদি। কেষ্টা বলেছিল, 'লক্-আপ-য়ে চা দিতে হবে'! তবে কি হরিশ এখনও আছে এখানেই!

লক্-আপ্ রুমের সিঁড়িতে পা দিয়ে অনাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে চলেছে তোলপাড় কাণ্ড! একজনকে জাপটে ধরেছে জন দুয়েক সিপাই আর একজন বাবু, ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে অনাদি, মানুষগুলোকে চেনবার চেষ্টা করে। দেখলে, আছে ওর মধ্যে বৈজনাথ, সকালের সেই কব্জি-চেপে-ধরা সিপাইটী আর একজন ইন্‌ফর্‌মার্‌বাবু। কিন্তু ব্যাপারটা কি! এমন ধ্বস্তাধ্বস্তিই বা কেন! ঝুঁকে পড়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে অনাদি, কার ওপর চড়াও হয়েছে এরা সদলবলে। দেখা গেল একটী তরুণকে, মুখখানা তার ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে না। গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে তার দুধের মত ফর্সা পিঠখানা, আর দেখা যাচ্ছে তার বলিষ্ঠ দুখানা হাতের কণুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত। সমস্ত শরীর দিয়ে সে ঢেকে আছে তার কব্জিদুটো—হাঁটুগেড়ে বসা দুটী উরুর মাঝখানে রেখে। বৈজনাথ আর সিপাইটী টানাটানি করছে তার কাঁধ ধরে, আর ইনফরমারবাবু একটী হ্যাণ্ড-কাফ্ নিয়ে চেষ্টা করছেন উরুর ফাঁকে হাতের কব্জি দুটোয় লাগিয়ে দিতে।

কে ওই ছেলেটী? প্রশ্ন জাগে অনাদির মনে। সহজ উত্তরই সে খুঁজে পায় বিনা দ্বিধায়, নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট। কিন্তু বৈজনাথ আর ওই সিপাইটীও! তাহলে শুধু ভাল মানুষ হয়ে ভাল থাকা যায়না! বৈজনাথ নিশ্চয়ই ভালমানুষ, কত সরল আর কত সহৃদয়! আর ওই সিপাইটী, ওর মধ্যেও তো রয়েছে মানবিক চেতনা! তবুও ওরাই একটী তরুণের ওপর করছে এমন জবরদস্তি!

ঠিক ভেবে পায়না অনাদি, এমন অবস্থায় সে কি করবে! ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে রামশরণও এগিয়ে যাচ্ছে ওই কুণ্ডলিটার দিকে জামার আস্তিন গোটাতে গোটাতে। রামশরণ নিশ্চয়ই যাচ্ছে তার সাথিদের সাহায্য করতে! কিন্তু ওই ছেলেটী—

হঠাৎ অনাদি দৌড়ে গিয়ে বৈজনাথের কাঁধটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে, "ক্যা, হুয়া ক্যা ? তুম্‌লোগ্ ক্যা পাগল হো গয়া ?"

আকস্মিক এই চিৎকারে সকলেই ওঠে চমকে, হাতের মুঠো যায় আলগা হয়ে। সেই সুযোগে ছেলেটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ সরাতে পারছেনা অনাদি ছেলেটীর মুখ থেকে। ভীষণ চেনাচেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছে! ওঃ, মনে পড়ে যায় অনাদির, সে-ও এই রকম পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলায়। সেদিন ছিল ভিয়েৎনাম দিবস—কলকাতায় তখন ১৪৪ ধারা। কিন্তু ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছিল ভবানিপুরে। এল্‌গিন্ রোডের কাছাকাছি পুলিশ পথরোধ করে দাঁড়াল। মিছিল বসে পড়ল রাস্তার ওপর। পুলিশ হুকুম দিলে মিছিল ভেঙে দিতে। কিন্তু ছাত্রেরা অটল। তারপর সুরু হল পুলিশের পাঁয়তারা। পুলিশভর্তি একখানা লরি প্রচণ্ড বেগে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে ছুটে আসছে মিছিলটার দিকে। ঝট্ করে আনোয়ার উঠে দাঁড়াল বুক ফুলিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিছিলটা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্।' রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে লোক গেছে দাঁড়িয়ে—ভয়ে, আতঙ্কে তারা চোখ বুজে আছে। ঘ্যাঁচ করে প্রচণ্ড এক শব্দ হল। চমকে চোখ খুলে দেখে আনোয়ারের সামনে হাত দশেক তফাতে লরিখানা ব্রেক্ কষে দাঁড়িয়ে আছে। আনোয়ার দু'হাত তুলে লাফ মেরে চিৎকার করে উঠল, 'বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ—' শুধু মিছিল নয়, এবার রাস্তার দু'ধারের মানুষও ফেটে পড়ে হুঙ্কারে, 'ধ্বংস হোক—'

চিনতে পেরেছে অনাদি, এ হল সেই আনোয়ার। সেদিন সে-ও নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে আনোয়ারের শ্লোগানে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তখন তো ছিল বৃটীশ আমল!

গা ঝেড়ে উঠে ইনফরমারবাবু অনাদির সামনে এসে খাঁখিয়ে ওঠেন, "আপনি যে বড় বাধা দিলেন ?"

"বাধা দেবনা !" বিস্ময়ের ভাণ করে অনাদি। সারাদিনের মধ্যে নিজেকে নিজের আয়ত্তে এমন ভাবে আর একবারও পায়নি। বললে, "লজ্জা করে না, নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন !"

"নিজেদের মধ্যে মারামারি করছি !" খেঁকিয়ে ওঠেন ইনফরমারবাবু, "চেনেন না ওই রত্নটাকে ?"

বৈজনাথ আর রামশরণকে দেখিয়ে অনাদি বললে, "ওতো এদেরই মতন এইটুকু একটা ছেলে !"

"এইটুকু ছেলে !" ভেঙচে ওঠেন ইনফরমারবাবু, "জানেন মশাই, আজ চারটা দিন ধরে আমাকে ঘোল্ খাইয়েছে—দৌড় করিয়েছে ব্যারাকপুর থেকে বজবজ। কত কষ্টে যে ধরেছি। সাংঘাতিক কমিউনিষ্ট মশাই ! ঘণ্টা দুই ধরে অফিসের সমস্ত লোককে নাকের জলে চোখের জলে করে তুলেছে ! এখনও পর্যন্ত নিজের নামটা কবুল করল না !"

হেসে ফেললে অনাদি, "তাই বুঝি নাক টিপে ধরে মুখ দিয়ে নাম বার করছিলেন ?"

"খুব যে রসিকতা করছেন, আপনি কে মশাই ?" এতক্ষণে খেয়াল হয় ইনফরমারবাবুর।

অনাদি বললে, "আমিও আপনাদের আসামী—"

"ওঃ, তাহলে আপনিও তো কমিউনিষ্ট ! আচ্ছা বলুন তো ওর নামটা কি ?"

তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ে হাসিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে অনাদি, "আপনি তো দেখছি অবাক করলেন মশাই ! একটা লোকের পেছনে ঘুরলেন চারদিন ধরে ব্যারাকপুর থেকে বজবজ। আজ তাকে ধরে নিয়ে এলেন সশরীরে, অথচ আপনিই জানেন না তার নাম !"

ইনফরমার বাবুটী কেমন যেন মুষড়ে পড়েন, "বেশ তো, আমি না জানি আপনি তো জানেন। বলুন না মশাই দয়া করে, তাহলে আপনার কমরেডও বাঁচেন হ্যাণ্ড-কাফ্ পরা থেকে আর আমিও বাঁচি এই ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করা থেকে—"

ভেবে পায় না অনাদি, শুধু নামটা বলায় কি আপত্তি আনোয়ারের! হয়তো আছে কিছু! আর নিজে থেকে যেচে বলবেই বা কেন! কেনই বা সে করবে এদের সঙ্গে কোন রকম সহযোগীতা! নিজের গলায় ফাঁসির দড়িটা পরিয়ে দেওয়ার জন্যেও কি এদের সাহায্য করতে হবে! আনোয়ারের ব্যবহারের সমালোচনা মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে মন থেকে। হাল্কা সুরে রসিকতার ঢঙে বলে ওঠে, "না মশাই, বৃথাই কথা বাড়াচ্ছেন আমার সঙ্গে! এর আগে ওঁকে আমি কখনও চোখের দেখাও দেখিনি, নাম জানা তো দূরের কথা। ওঁর হাতে হ্যাণ্ড-কাফ্ পরালে যদি আপনাদের রাজত্ব বেঁচে যায়, তাহলে এখনি পরিয়ে দিন। আর একটুও দেরী করবেন না—"

হতাশ হয়ে পড়েন ইনফরমারবাবু, এর পর কি করা যায় কিছুই যেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না! কিন্তু অল্প টাকা মাইনের চাকরীটাও বুঝি যায়! বাস্তুহারা হয়ে এদেশে এসে ফেরীওয়ালার কাজ না করে, লোকের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানর কাজটা খুব মন্দ মনে হয়নি। ট্রামে ভাড়া লাগে না, তালগোল দিয়ে একটা বিল্ করতে পারলে মাঝে মাঝে দু'একটা টাকাও আসে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি করাও তো আর পোষায় না! বারান্তরে অনাদি আর আনোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মধ্যপথে। তখনও আনোয়ার হাঁপাচ্ছে না রাগে ফুঁসছে, অনাদি ঠিক বুঝতে পারে না।

বৈজনাথ আর রামশরণ ব্যাপারগতিক দেখে পরস্পর গা টেপাটেপি করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। দরজার পাশে মাটীতে উবু

হয়ে বসে বাঘবন্দীর ঘর কাটে বৈজনাথ আর ঘুঁটি বসায় রামশরণ। আর বাকী সিপাইটী সরে এসে চৌকাঠের ওপর বসে খৈনি বানাতে সুরু করে দেয়।

আরও দু'এক পা এগিয়ে যান ইনফরমারবাবু। আবেদনের সুর ফুটে ওঠে তাঁর গলায়, "কেন দাদা এমন করছেন! আমি কি আর সাধ করে আপনার হাতে হাতকড়া পরাতে এসেছি! আপনি আর আমার কোন বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছন! কিন্তু জানেনই তো এখানকার ব্যাপার-স্যাপার—"

ইনফরমারবাবুর কথার জের টেনে ভেবে চলে অনাদি, হাত-কড়া এরা পরাবেই, দরকার পড়লে সিপাই শান্ত্রী, গুলিগোলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আনোয়ারের ওপর, আর বিধান দেবে—সিকিউরিটী এ্যাক্টে সে অধিকার এদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আনোয়ার এ ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি করেনি আর ভদ্রলোকেরও নেই আনোয়ারের ওপর কোন আক্রোশ। তবুও এ ভদ্রলোক আনোয়ারের পেছনে হণ্যে কুকুরের মত ঘুরেছেন গত চারদিন ধরে!

দরজার বাইরে মুখটা ফিরিয়ে নেয় অনাদি। বৈজনাথ আর রামশরণ বাঘবন্দী খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের বোধহয় মনেও নেই, আর কিছুক্ষণ আগে তারা সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটী তরুণের ওপর! আবার হয়তো এখনই ওরা ছুটবে আনোয়ারের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ আনতে বুকভরা দরদ নিয়ে। অনাদির মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে, এমন কেন হয়?

সামনে-বাড়ীর দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসছেন হেমবাবু, মুখখানা তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট, চলেছেন কেমন যেন আনমনা হয়ে। দিনের শেষ হয়ে এসেছে, হয়তো আজকের মত তাঁর কাজ শেষ হল। এইবার তিনি বাড়ী ফিরবেন। সেখানে তিনি হয়তো স্বামী, পিতা, বড়ভাই, কতজনের

একমাত্র ভরসাস্থল! হয়তো বাড়ীতে তাঁরও অনাটন, মাইনের টাকায় সংসার চলছে না! হয়তো ভাবনা ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ ভেবে, মনের মত করে মানুষ করতে পারছেন না তাদের!

আপনা হতেই উঠে দাঁড়ায় অনাদি আশু বাড়িয়ে হেমবাবুর কাছে যাওয়ার জন্যে। সহসা তার মনে হয়, সারাদিনের সমস্ত কাজ শেষ করে যখন তিনি শুতে যাবেন, তখন কি তাঁর মনে পড়বে, কোন এক অনাদিকে অযথা ধরে এনে কি ব্যবহার তিনি করেছেন তার সঙ্গে! আবার তখনই অনাদির মনে হয়, সে অবকাশ কি আছে হেমবাবুর জীবনে? তার নিজের জীবনে সে তো কোন দিনই পারেনি এমন করে ভাবতে!

ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে অনাদি। চৌকাঠ পার হতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আর কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের মধ্যেই চলছিল তুমুল কাণ্ড! মুখ ফিরিয়ে পেছন পানে তাকিয়ে দেখে, ইনফরমারবাবু সেই মধ্যপথেই আছেন দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণনয়নে আনোয়ারের দিকে চেয়ে, আর আনোয়ার দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে পিঠ রেখে কোণ ঠেসে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। চকিতে অনাদির মনে হয়, যেন দুটো শক্তি আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে শেষ লড়াইয়ের জন্যে!

"আসুন অনাদিবাবু—" হেমবাবুর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে নেমে যায় অনাদি লক্-আপ্ রুমের সিঁড়ি বেয়ে।

পনেরো

হুড্ খোলা পুলিশভ্যানে উঠে বসল অনাদি। তার দুপাশে এসে বসল বৈজনাথ আর রামশরণ মহাকলরবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। গাড়ীতে ওঠার আনন্দে ওরা মসগুল্, আসামী সম্বন্ধে হুঁশিয়ারীর কোন চিহ্নও নেই ওদের চোখেমুখে। পুলিশভ্যানে বসে সদর রাস্তা দিয়ে যেতে হবে লালবাজার পর্যন্ত, এইটাই হয়ে উঠেছে অনাদির ভাবনার বিষয়। দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের চোখের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে তাকে! কিন্তু কয়েদীর মত পোষাক নয়তো তার! লোকে যদি ভাবে, পুলিশেরই একজন লোক সে!

কাগজপত্তর নিয়ে এসে হেমবাবু বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার দিলে গাড়ী ছেড়ে। প্রথম হেঁচকায় অন্যমনস্ক অনাদি টাল্ সামলাতে না পেরে পড়ে যায় বৈজনাথের ঘাড়ের ওপর। খপ করে রামশরণ অনাদিকে ধরে ফেলে। তারপর রামশরণ আর বৈজনাথের সে কি খিলখিল্ করে হাসি!

থিয়েটার রোড দিয়ে বেরিয়ে লরিখানা চলতে সুরু করে সোজা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে, তারপর রেড্ রোড, ডালহৌসি, লালবাজার—ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে বিরাট এক লোহার ফটকের সামনে। তড়াক করে লাফিয়ে পড়েন হেমবাবু, হন্‌হন্ করে হেঁটে যান ফটকের দিকে। বৈজনাথও নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকে লরির পাশেই আর রামশরণ অপেক্ষা করতে থাকে অনাদির নামার জন্যে।

থর্‌থর্ করে কাঁপছে অনাদির পা দুটো, বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে, চাপা কান্না ঠেলে ঠেলে উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে।

রামশরণ অনাদির পিঠে হাত রেখে বললে, "চলিয়ে বাবু—"

উঠে দাঁড়ায় অনাদি যাদুকরের লাঠির ছোঁয়া পাওয়া নিষ্পন্দ একটা

বস্তুর মত। ধীরে ধীরে নামে অনাদি লরির ওপর থেকে। কাপড় সামলানর কথা আর মনের ধারে কাছেও আসে না। চোখদুটো তার নিবদ্ধ বিরাট ওই লোহার ফটকটার ওপর। এগিয়ে চলে অনাদি একতলা সমান উঁচু ফটকটার দিকে, আর তার সঙ্গে তার দুই পাশে চলে রামশরণ আর বৈজনাথ তাল রেখে, লাঠি ঠুকে। ফটকের সবটা খোলা হয়নি। নিচের দিকে ছোট একটা পাল্লা আছে হামেশা যাতায়াতের জন্যে। তার মধ্যে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ছোট্ট ওই ফটকটার সামনে এসে ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি। মাথা তুলে একবার চায় কড়িকাঠ পর্যন্ত উঁচু মোটা মোটা লোহার শিক্‌গুলোর দিকে। চোখ নামিয়ে নিয়ে একবার পেছন ফিরে চায়। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বৈজনাথ আর রামশরণ। ওদের মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। মুখদুটো ওদের একই রকম করুণ দেখাচ্ছে। যতবারই অনাদি ওদের লক্ষ্য করে দেখেছে, ততবারই দেখেছে ওই একই বিষাদের ছাপ ওদের মুখে। ওরই ফাঁকে মনে পড়ে, সুজিত আর অজিতেরও তো তাই-ই!

ফটকের ভেতর দিকে আর একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। সে বললে, "চলা আইয়ে জলদি—"

মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিয়ে অনাদি ঢুকে পড়ে। পুলিশটা তাকে অনুসরণ করতে বলে আগে আগে চলতে থাকে।

লালবাজার লক্‌-আপ্‌-এর দপ্তরে আসামীকে জমা করে দিয়ে হেমবাবু বেরিয়ে যান হন্তদন্ত হয়ে। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, "কাল এগারোটার সময় তৈরী থাকবেন অনাদিবাবু—আমি এসে কিন্তু দাঁড়াতে পারব না—" কথা শেষ করতে করতেই হেমবাবু পৌঁছে যান লোহার ফটকের সামনে।

কেন যেন অনাদির মনে হয়েছিল, অন্তত একবারের জন্যেও হেমবাবু

পেছন ফিরে চাইবেন। তাই সে তাকিয়ে ছিল চলমান হেমবাবুর দিকে নির্নিমেষে। ফটক পার হয়ে হেমবাবু গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের পাশে, হাতের ফাইলটার ওপর ঝুঁকে পড়ল তাঁর মাথা। চোখ না তুলেই তিনি হেঁকে উঠলেন, "হেই দরোয়াজ—"

বৈজনাথ আর রামশরণ সারাদিনের কাজের পর বোধহয় ক্লান্ত, তাই তারা চলেছে ধীরে ধীরে। হাঁক শুনে তারা দৌড়তে সুরু করে। হেমবাবুর মুখে তখনও ব্যস্ততার ছাপ, অনেক কাজ তাঁর তখনও বোধহয় বাকী! অনাদির বিস্ময় জাগে, তবে যে সে দেখেছিল তাঁর মুখে ক্লান্তির ছায়া! সে কি তার দৃষ্টিবিভ্রম! ক্লান্ত হওয়ার অবকাশ তাহলে নেই হেমবাবুরও!

"চলিয়ে বাবু—"

চমকে উঠে অনাদি পেছন ফিরে চায়। গালপাট্টা দাড়িওয়ালা এক পুলিশ তার পেছনে দাঁড়িয়ে। অনাদি বললে, "কিধর?"

"দোতল্লাপর্—" বলেই পুলিশটী হাঁটতে সুরু করে হাতের চাবির গোছা দুলিয়ে। নাল্ লাগান জুতোর আওয়াজ বিরাট ওই বাড়ীটার মোটা মোটা দেয়ালে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে। ধীরে ধীরে পুলিশটী একটী একটী করে সিঁড়ি উঠছে আর অনাদি তাকে করছে অনুসরণ। এখানে নেই কোন তাড়াহুড়ো, সচকিত সজাগ দৃষ্টি নেই—এই বাড়ীটার সমস্তটাই বুঝি লোহার গরাদ আর মোটা তারের জাল দিয়ে মোড়া, তার প্রতিটী রন্ধ্র সুরক্ষিত! তাই বুঝি এখানে নেই হেমবাবুর মত ব্যস্ততা, দপ্তরের বাবুরা থেকে গালপাট্টা দাড়িওয়ালা এই পুলিশটী পর্যন্ত অবিচলিত, উদাসীন!

দোতলার চাতালে উঠে ডান হাতে সারিসারি ঘর, সবই লোহার ফটকওয়ালা, প্রত্যেকটা দরজায় ঝুলছে বিরাট বিরাট তালা। বাঁয়ে বারান্দার রেলিঙ, খিলান পর্যন্ত উঁচু পাঁচিলে ঢাকা। পাঁচিল আর

খিলানের ফাঁকে ঘুলঘুলি দিয়ে আসা পড়ন্ত বেলার আলো যেন ছায়ার সঙ্গে মিশে গেছে। কেমন থমথমে একটা ভাব। বাড়ীটার কোথাও কোন শব্দ নেই, ঘরগুলোয় মানুষ আছে কিনা বুঝবার উপায় নেই, সেগুলোর মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল থেকে থেকে ভেসে আসছে চিৎপুর রোড থেকে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, বাস কণ্ডাক্টরের তারস্বরে চিৎকার আর কচিৎ কোন ফেরিওয়ালার হাঁক। বাড়ীটা ঘুমিয়ে আছে নিঃশব্দ এক দ্বীপের মত আর তার চারিদিক ঘিরে চলেছে জীবনের কোলাহল।

প্রথম থেকে তিনটে ফটক ছেড়ে পুলিশটী চতুর্থ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তালায় চাবি লাগায়। অনাদির কানটা খাড়া হয়ে ওঠে, কেমন চেনা চেনা শব্দ! তালা খোলা হল, হুড়কো সরিয়ে দিলে খড়াং করে, দরজাটা ঠেলে দিলে ভেতর দিকে—কেমন যেন বারম্বার শোনা পরিচিত একটা ছন্দ! মনে আনবার চেষ্টা করে অনাদি, এ শব্দটা কেন তার চেনা মনে হচ্ছে! কেন তার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠছেনা ওই ঝণৎকার শুনে! সে তো জানে, আর এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে পুরে দেবে অন্ধকার ওই গহ্বরটার মধ্যে!

মনে পড়ে যায় অনাদির চট্ করে, বহু ফিল্মে সে দেখেছে এই দৃশ্য। বহু ফিল্মে এই দৃশ্যটী একটী অপরিহার্য অঙ্গ। কতই রোমাঞ্চকর করে দেখান হয় জেলের গেট্ আর কয়েদীকে! তাই বুঝি এর ভয়াবহতা গেছে মরে!

খোলা পাল্লার কড়ায় তালাটা লাগিয়ে দিয়ে, চাবির গোছা হাতে নিয়ে পুলিশটী জলদগম্ভীর স্বরে বললে, "আইয়ে—"

নিঃশব্দে অনাদি ঢুকে যায় কালো গহ্বরটার মধ্যে। দিন তো এখনও যায়নি, তবুও এত অন্ধকার! অনাদির দৃষ্টি হয়ে যায় ঝাপসা। কেবল শুনতে পায় তার পেছনে লোহার ফটক বন্ধ করার ঝনাৎ শব্দ, তারপর তালা লাগানর খড়খড় শব্দ—বহুদিনকার পরিচিত সিনেমার

দেখা রোমাঞ্চকর কারাগারের ছন্দোময় শব্দ! কান পেতে অনাদি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে দূরে চলে যায় নাল্ লাগান জুতোর ধীর মন্থর পদক্ষেপ, খট-খট-খট। এক সময়ে সে নাল্ লাগান জুতোর আওয়াজও থেমে যায়। অনাদি তখনও দাঁড়িয়ে আছে ঘুটঘুটে ওই অন্ধকারের মধ্যে। ভয়ে বিস্ময়ে সে জড়সড় হয়ে উঠেছে, এই অন্ধকারের মধ্যেই কি কাটবে তার বাকী জীবনটা!

ঘরের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে অনাদি অস্বাভাবিক চমকে ওঠে। কে যেন বললে, "আপনার ডানদিকের দেয়ালে সুইচটা আছে, আলোটা জেলে দিন।"

নির্দেশ অনুসারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নেয় অনাদি সুইচটা। জ্বলে ওঠে পাঁচ ওয়াটের একটা বাল্ব। আরও একবার চোখে ধাঁধা লাগে অনাদির। ঘর জোড়া অন্ধকার ছোট্ট ওই আলোটুকুকে যেন ঢেকে ফেলতে চাইছে। বিস্ময় লাগে অনাদির এত কম আলোর ব্যবস্থা দেখে। মনে পড়ে যায়, এমনই ব্যবস্থা তো পুলিশ বিভাগের সর্বত্রই! থানার ফাটক, রিসেপশন্ রুম্, এস্. বি, অফিসের সেই ঘর, লক্-আপ-রুম্, সর্বত্রই আলোর চেয়ে অন্ধকারের প্রাধান্যই বেশী! প্রশ্ন জাগে মনে, এরও কি কোন তাৎপর্য আছে নাকি!

আলোটা ধীরে ধীরে চোখে সহে যায়। ওই আলো-আঁধারির মধ্যে চোখ টান করে তাকিয়ে অনাদি দেখলে, আরও দুজন লোক রয়েছেন ওই ঘরের মধ্যে! বসে আছেন তাঁরা মুখোমুখি। সস্মিত মুখে বয়োজ্যেষ্ঠ অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন—"

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় অনাদি। বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর বিছানাটা দেখিয়ে বললেন, "বসুন না—"

বসে পড়ে অনাদি। বয়োকনিষ্ঠ তার মুখোমুখি ঘুরে বসে বললে, "কখন নিয়ে এল আপনাকে?"

"সেই ভোরে, বোধহয় তখন রাত চারটে—"

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে যুবকটী, "হ্যাঁ, ওই সময়টাতেই ওরা হানা দেয়। চোরেরাও সিঁদ কাটার জন্যে ওই সময়টাকেই পছন্দ করে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ আবার সহৃদয় প্রশ্ন করেন, "কোথা থেকে ধরল আপনাকে ?

"বাড়ী থেকে।"

"কিছু পেলে নাকি ?"

"না।"

মাঝ থেকে বয়োকনিষ্ঠ আবার বলে ওঠে, "পাওয়ার তো কোন দরকার নেই। ওদের কোটা পূরণ করা নিয়ে কথা।"

বিস্ময়ে অনাদি প্রশ্ন করে "সে আবার কি !"

"তা-ও জানেন না বুঝি। পুলিশদের সব কোটা থাকে। ওই যে ট্রাফিক পুলিশ—ওদের সপ্তাহে সাতটা কেস্ দিতে না পারলে মাইনে কাটা যায়।"

কেমন যেন অবাস্তব মনে হয় অনাদির যুবকটীর কথা। শুধুই কি কোটা পূরণ করার জন্যে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে ! তাহলে রসময়বাবুর খোঁজ করে কেন তার কাছে ! কেনই বা তাহলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি করে তার সাইন বোর্ড খুলে এনে লুকিয়ে রেখেছে লোক-চক্ষুর অন্তরালে !

বয়োজ্যেষ্ঠ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক সুশীল। বৃটীশের আমলে যে এফিসিয়েন্সি এদের ছিল, আজ তার কাণাকড়িও নেই।"

সুশীল বলে ওঠে, "কি করে থাকবে কিরণদা। দেশের মানুষকে কাজ দেখানর কোন সুযোগটাই বা এরা দিয়েছে !"

প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে অনাদিকে জিজ্ঞেস করলেন কিরণবাবু,

"তাহলে সারাটা দিন ধরে আপনাকে টানা হেঁচড়া করেছে! স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি বোধহয়?"

হাল্কা কথাবার্তার ফাঁকে অনাদি যেন একটু সহজ হয়ে ওঠে, বললে, "স্নান না হোক মাথায় জল দিতে হয়েছে বার তিনেক আর হেমবাবু খাইয়েছেন বড় বড় গরম গরম লুচি—"

হো হো করে হেসে ওঠে সুশীল, "ওঃ, ওই হেমবাবুটী একটী আস্ত ঘোড়েল, এক্কেবারে যাকে বলে ভিজে-বেড়ালটী!"

অনাদি কিরণবাবুকে নিকটস্থের সুরে জিজ্ঞেস করলে, "আর আপনারা?"

কিরণবাবু যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, কমিউনিষ্ট ওঁরা কেউই নন—মূলতঃ কংগ্রেসী। তবে বর্তমান কংগ্রেসী নীতির সঙ্গে তেমন বনিবনা হচ্ছে না—তাই বাধছে খটাখটি প্রতি পদে পদে সরকারী গদীতে অসীন কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে। টেররিষ্ট যুগে তাঁরা ছিলেন যুগান্তরপন্থী। বোধহয় সেই সুযোগ নিয়ে গদীয়ান কংগ্রেসীরা নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যে তাঁদের ফাঁসাতে চায় একটা ব্যাঙ্ক লুঠের মামলায়। দিন পনেরো তাঁরা আছেন এখানে। এখন তাঁদের ইন্‌টারোগেশন্ হচ্ছে ডি, ডি, অফিসে।

কিরণবাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল বলে ওঠে অনাদিকে, "আপনাদের, মানে কমিউনিষ্টদের একটা কথা কিন্তু আমার ঠিক বলেই মনে হয়। কমিউনিষ্ট আতঙ্কের জিগির তুলে এই সরকার আসলে চাইছে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে দমন করতে। কাজেই সরকারী জুলুমটা কেবল কমিউনিষ্টদের জন্যেই, এমন কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকলে নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারা হবে।"

কিরণবাবুর কটা-কটা চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠে, কটমট করে সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন, "রাজনীতিটা অত সহজ নয় সুশীল!"

সুশীল যেন কুঁচকে গিয়ে আমতা আমতা করে ওঠে, "কিন্তু কিরণদা—"

"আমি যা বলছি শোন—" কিরণবাবুর স্বর ধমকের মত শোনায়।

এমন একটা পরিস্থিতিতে অনাদি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। ইচ্ছে করে উঠে পড়তে, কিন্তু সোজাসুজি ওঁদের মুখের সামনে উঠে দাঁড়াতেও সঙ্কোচ জাগে। তুলনাটা যেন অনাদি তার নিজের অজ্ঞাতেই করে বসে, রসময়বাবু, কেষ্টবাবুদের সঙ্গে—কোথায় যেন রয়েছে বিরাট পার্থক্য। অস্বস্তি লুকোবার জন্যে ঘরটার ওপর চোখ বুলিয়ে চলে অনাদি। ঘরের মধ্যে খান চারেক খাট আর তার ওপর রাশিপ্রমাণ কম্বল। কিরণবাবু আর সুশীলের বিছানা দুটো মেঝের ওপর পাতা পাশাপাশি, ধবধবে সাদা দুখানি চাদরে ওই অল্প আলোতেই ঝল্‌মল্‌ করছে!

ক্লান্ত অনাদিকে বিছানা দুটো হাতছানি দিয়ে ওঠে। ঝপ্‌ করে উঠে পড়ে অনাদি বললে, "তাহলে ওই কম্বলগুলো পেতেই শুতে হবে?"

মুচকে হাসেন কিরণবাবু, "অগত্যা! আপনি তো দেখছি সঙ্গে কিছুই আনেন নি। বাড়ী থেকে কেউ দেখা করতেও আসেনি?"

কথাটা যেন তীরের মত এসে বেঁধে অনাদিকে। বাড়ী! তার বাড়ী কই! কে আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে! নিঃস্বতার অনুভূতিতে মনটা তার দুমড়ে মুচড়ে যায়, বোধহয় এক ফোঁটা জলও বেরিয়ে আসে চোখের কোল ছাপিয়ে। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অনাদি কিরণবাবু আর সুশীলের দিক থেকে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সমস্ত শরীর, মাথার মধ্যে করছে দপ দপ্‌। অসহায়ের মত ঝুলে পড়েছে মাথাটা বুকের ওপর।

ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে যায় অনাদি লোহার ফটকটার দিকে।

সংসার যদি সে আজ পাততে পারত কলকাতায়, তাহলে কি আর বাড়ী থেকে কেউ আসত না! আর সে জায়গায় মা জানতেও পারলেন না এ খবরটা! লোহার দুটো গরাদ অনাদি চেপে ধরলে মুঠো করে। শরীরটা যেন তার নিস্পন্দ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মা জানলেন না, চিণুও জানল না! কিন্তু জানানর মত খবর তো এটা নয়। এ খবর ওঁদের কাছে তার মৃত্যু সংবাদেরই সামিল।

মাথাটা ঠেকিয়ে দেয় অনাদি লোহার গরাদ দুটীর মাঝখানে। সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পায়, গালপাট্টা দাড়িওয়ালা সেই পুলিশটা টুলের ওপর বসে দেয়ালে হেলান্ দিয়ে ঢুলছে। আর বারান্দার পাঁচিলের ওপর দিয়ে খিলানের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে চিৎপুর রোডের আলো।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। ট্রামের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ আরও মুখর হয়ে উঠেছে। অসীম কৌতূহল জাগে অনাদির চিৎপুর রোডটাকে একবার চোখের-দেখা দেখার জন্যে। ট্রামের চলাচল, বাসের হুড়োহুড়ি, অগনন মানুষের সারি যেন ভেসে ওঠে চোখের ওপর। আর ভেসে ওঠে তার চেনা পরিচিত প্রতিটী মানুষ—অফিসের সহকর্মিরা, তার বাড়ীর বাসিন্দারা, ঠেক্‌র খদ্দেররা। কিন্তু এত মানুষের মধ্যে কাকেও সে আপন করে নেয়নি, ডেকে নেয়নি কাছে। সে চেয়েছিল বাঁচতে একা একা, তার দুনিয়াটা ছিল মা, দুটী ভাই আর চিণুকে নিয়ে।

কিন্তু, ওইতো ডেকেছিলেন রসময়বাবু, 'আসুন অনাদিবাবু, কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এসে দুনিয়াজোড়া শোষিত মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানবতার জন্যে লড়াই করি।' রসময়বাবুর ডাকে সে সাড়া দেয়নি, তখনও তার ছিল মোহ, একাই সে জীবনকে গড়ে তুলবে, ভরে তুলবে সম্পদে। তবুও তো আরও কত মানুষ তাকে কাছে ডেকেছে। ডেকেছেন ওই শান্তশিষ্ট বৌটী। পুলিশের নাল্ লাগান

বৃটের ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করে, বাড়ী ঘেরাও করা এক বাহিনী পুলিশের রক্তচক্ষুকে তাচ্ছিল্য করে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

লোহার গরাদের ওপর অনাদির দৃঢ় মুষ্টি আলগা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। সরে আসে সে ফটক ছেড়ে, পেছন দিকে হাত দুটো পিছমোড়া করে পায়চারী করতে থাকে ঘরময়। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন, আজ যদি সে না হত দেশত্যাগী, তাহলে? কিন্তু পারেননি মা স্বামীর ভিটেতে থাকতে বিধবা হওয়ার পর! পারেনি সে মায়ের কোলে থাকতে অর্থ আর সামর্থের অভাবে! হয়তো সুজিত আর অজিতকেও এবার বেরোতে হবে দেশ ছেড়ে দিনান্তে একমুঠো ভাতের জন্যে বৈজনাথ আর রামশরণের মতই। হ্যাঁ, বৈজনাথও বলেছিল, 'বড়ভাই মজদুরী করতে শহরে চলে এসেছে তিন সাল আগে। নোকরী মাঝে মাঝে হয়, আবার ছুটেও যায়। ঘরে টাকা সে ভেজতেই পারে না।'

কিন্তু এমন কেন হয়! তার ঠাকুর্দাতো কোনদিন গ্রাম ছাড়েন নি। তাঁর নাকি ছিল অনেক জমিজমা। তার থেকেই ছিল তাঁর প্রাচুর্যভরা বাঁচার সংস্থান। বাবার আমলে সে জমিজমা যেন উবে যেতে লাগল—জীবনের সংস্থান হয়ে এল অপ্রতুল, তবুও তাঁকে চাকরীর ধান্দায় দেশঘর ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে যেতে হয়নি। যে শিকড় আলগা হয়ে এসেছিল পিতার জীবনে, সেই মূল থেকে সে হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন—এখন ভেসে চলেছে স্রোতের টানে।

তাহলে শুধু ভারত বিভাগের ফলেই মানুষ আজ বাস্তুহারা হয়নি! মানুষ ছিন্নমূল হতে সুরু করেছে ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কায়েম হওয়ার দিন থেকেই। তাই বুঝি বাঙলার লোক ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে অন্নের ধান্দায়। সেই অন্নের সংস্থান করার জন্যে কলকাতায় এসে জমা হয়েছে ভারতের সমস্ত প্রদেশের মানুষ। ভারতের মানুষকেও

সেই একই অন্নের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে গেছে বর্মায়, মালয়ে, আফ্রিকায়।

লোহার ফটকে খড়খড় করে শব্দ হয় তালা খোলার। চমকে উঠে অনাদি সেইদিকে ঘুরে দাঁড়ায়, আবার কি চায় এরা!

গালপাট্টা দাড়িওয়ালা পুলিশটা হাঁক পাড়ে, "গোসল্‌কে লিয়ে য়েক্ য়েক্ আদমী চলিয়ে—" লোহার ফটকটা ঠেলে খানিকটা ফাঁক করে দেয়।

কিরণবাবু বললেন, "যাও সুশীল, স্নান সেরে এসে তোমার গামছা আর সাবানটা অনাদিবাবুকে দাও—"

সুশীল বেরিয়ে গেল। জামা গেঞ্জি খুলে অনাদি সেগুলোকে রাখলে খাটের ওপর। সারাদিনের পর গায়ে একটু হাওয়া লাগছে, ভেপসে ওঠা শরীরটা যেন তাজা হয়ে উঠছে।

কিরণবাবু বললেন, "এক কাজ করুন অনাদিবাবু, খানচারেক কম্বল ভাঁজ করে পেতে দিন, একটাকে পাকিয়ে বালিশ বানিয়ে নিন আর পাকান কম্বলটায় জড়িয়ে নিন একটা খবর কাগজ, ইচ্ছে করলে একখানা বিছানাতেও পেতে নিতে পারেন। কাল নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে লোক আসবে দেখা করতে, তখন বলে দেবেন জিনিষগুলো পৌঁছে দিতে।"

বাড়ী থেকে লোক আসার কথায় অনাদি আবার যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। এই এতবড় কলকাতা শহরে এমন একজন লোকও নেই, যে তার প্রয়োজনের কথা অনুভব করে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে! কোন কথা না বলে অনাদি বিছানা বিছিয়ে ফেললে কিরণবাবুর নির্দেশমত। বিছানার অভিনবত্ব পারে না অনাদিকে বিচলিত করতে। তার জীবনে ইতিমধ্যে খাওয়া, থাকা আর শোয়ার জন্যে অনেক অভিনবত্ব তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

স্নান সেরে সুশীল ফিরে এলে অনাদি তার গামছাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সাবানটা আর নিতে পারেনা সে। সঙ্কোচের বেড়া এতক্ষণের মধ্যেও কেন যে কাটল না, সেটা অনাদির কাছে ধরা পড়ে গেছে। রসময়বাবুর সঙ্গে কিরণবাবুর ব্যবহারের মূলগত পার্থক্য আছে।

তোড়ে কল দিয়ে জল পড়ছে। তার তলায় মাথা পেতে দিয়ে অনাদি চোখ বুজে বসে রইল। শরীরে যত উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছিল, সব যেন বেরিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শরীর আর মনও পড়ছে থিতিয়ে। তারই ফাঁকে আর একবার অনাদির মনে পড়ে, চাকরীটা তাহলে গেলই!

তার চাকরীর সঙ্গে একসূত্রে যারা গাঁথা তাদের মুখগুলোও একে একে ভেসে ওঠে অনাদির চোখের ওপর। তার চিরদুখিনি মায়ের মুখে তাহলে হাসি সে ফোটাতে পারল না! পারল না তাহলে সে চিণুর সংগ্রামে কোনই সাহায্য করতে! আরও পারল না সে ভাই দুটীকে মানুষ হয়ে উঠবার মত রসদ জোগাতে! পারল না সে কিছুই—কোন কাজেই সে লাগল না!

কান্নার একটা আবেগ অনাদির বুকখানাকে মথিত করে বেরিয়ে আসে। এবার আর অনাদি চাপতে পারে না কান্নার সেই বিপুল বেগ। চব্বিশ বছর বয়সে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে মুখে হাত চাপা দিয়ে। মাথার ওপর অঝোর ধারায় পড়ছে কল থেকে জল। এমন সুযোগ বোধহয় আর কোথাও সে অনেকদিন পাবে না। এত নির্জনতা আর এত অন্ধকার পৃথিবীতে বোধহয় আর কোথাও নেই! চোখের জল তার কেউ দেখতে পাবে না, কান্নার গোঙানি কেউ শুনতে পাবে না, আর বুঝতেও পারবে না কেউ চব্বিশ বছরের একজন যুবক ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! তবে আর বাধা কিসের? প্রাণ ভরে নিক না সে খানিকটা কেঁদে!

ষোল

খাওয়ার ব্যাপারটা চুকে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল অনাদি। তারপর সে শুয়ে পড়বে। ঠাণ্ডা মাথায় নিরিবিলিতে তাকে ভাবতে হবে অনেক কথা—একেবারে জীবনের আদ্যোপান্ত। জীবনটাকে যেন নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে।

কিরণবাবু আর সুশীল শুয়ে পড়েছেন যে যার বিছানায়। কণুইয়ের ওপর ভর দিয়ে, হাতের তালুতে মাথা রেখে, মুখোমুখি দুজনে কথা কইছেন খুব চাপা গলায়। আবার নেমে এসেছে নিঃশব্দতার অভিশাপ বাড়ীটার বুক চেপে।

প্রায় আধটা ঘণ্টার জন্যে অনাদি ভুলে গিয়েছিল সব কিছুই। সে কি তুমুল কাণ্ড! খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে এমন হৈ-হট্টগোল হতে পারে, এটা ছিল তার কল্পনার বাইরে—এক সে দেখেছিল যুদ্ধের বাজারে দুর্ভিক্ষের সময়। 'এ' ডিভিসনের বন্দী ছিল তারা মাত্র ওই তিনজনই, আর 'বি' ডিভিসনের এক পাল—ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, হিন্দুস্থানি, বাঙালী, চীনা—সে এক সাত-জাতের মেলা! ওদের মধ্যে আছে চোর, পকেটমার, স্মাগলার, কি না! 'এ' ডিভিসনের খাতির—মাছ, মাংস, ডিম, দই, ফল আর 'বি' ডিভিসনে স্রেফ ভাত আর ডাল। অনাদির কেমন যেন লজ্জা করছিল 'বি' ডিভিসনওয়ালাদের পাশে হাত চারেক তফাতে বসে খেতে। সে কি লোলুপ চাহনি! কিন্তু হেমবাবুদের রাজত্ব এখানেও। সুশীল লাঙ্গরীটার সঙ্গে রসিকতা করেছিল বেশ, 'হ্যাঁ বাবা, মাছ কাটার সময় তোমার হাতটা কেটে যায়নি তো!' কিরণবাবু বলেছিলেন, 'ডিম বুঝি এর চেয়ে ছোট আর পাওয়া যায়না?' অনাদির মনে পড়েছিল হরিশের কথা, হেমবাবুর ফিফটী পার্সেণ্ট, কেষ্টার টেন্ পার্সেণ্ট—কাজেই এর চেয়ে

বেশী আর জুটবে কেমন করে। কিন্তু 'বি' ডিভিসনের ব্যাপারই আলাদা। আরও এক হাতা ভাতের জন্যে হয়ে গেল এক বৃদ্ধের সঙ্গে লাঙ্গরীদের হাতাহাতি। এক হাতা ডালের জন্যে হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু বেশ মজা ওদের, সব ব্যাপারেই ওরা একজোট্।

আবার ঝিমিয়ে আসছে বাড়ীটা। শুধু ওইটুকু সময়ের জন্যেই যেন প্রেতপুরি উঠেছিল জেগে। ফটকে ফটকে তালা দিয়ে গালপাট্টা দাড়িওয়ালা পুলিশটা আবার গিয়ে বসেছে তার টুলটায়—ঢুলুনির ঝোঁকে এরই মধ্যে ঘাড়টা তার লট্‌পট্ করতে সুরু করেছে।

অনাদি ঠিক করলে, একটা বিড়ি খেয়ে সে এবার শুয়ে পড়বে। পকেটে হাত দিয়েই মনে পড়ে কিরণবাবু আর সুশীলের কথা। বেশ তো, সকলে মিলে মৌজ করে এক রাউণ্ড বিড়ি খাওয়া যাক্। কিরণবাবু বলেছেন, এরপর আর কোন উপদ্রব করবে না এরা। ঘুমটা তাহলে বেশ ভালই হবে।

কিরণবাবুর দিকে বিড়ি, দেশলাই এগিয়ে ধরতে তিনি বললেন, "আমরা খাই না—আপনি খান।"

সুশীল জিজ্ঞেস করলে, "নিচে বুঝি আপনাকে সার্চ করেনি?"

মনে করবার চেষ্টা করে অনাদি বলে, "কই না তো।"

কিরণবাবু সুশীলের সমস্যাটা সমাধান করে দেন, "ওঁকে ভালমানুষ দেখে হয়তো অতটা খেয়াল করেনি।"

সোজাসুজি প্রশ্ন করল সুশীল, "আপনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য?"

চট্ করে অনাদির মনে পড়ে যায়; রামশরণও এই একই প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু এ দুই প্রশ্নকারীর মধ্যে কি বিরাট তফাৎ। কথা আর না বাড়িয়ে সংক্ষেপে সেরে দিলে, "না।"

সগর্ব দৃষ্টিতে কিরণবাবুর দিকে চেয়ে সুশীল বলে ওঠে, "সেই কথাই কিরণদা বলছিলেন। বোধহয় সেই জন্যেই আপনাকে সার্চ করেনি।"

কেমন যেন বিস্ময় জাগে অনাদির, কিরণবাবুর তাকে ভালমানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু কমিউনিষ্ট মনে হয়নি। অথচ কমিউনিষ্ট মনে হওয়াটাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। এও যেন অনেকটা ওই হেমবাবুর মত ভাব—হরিশ একজন দাগী আসামী, কিন্তু তার কেস্‌টা খুবই সিম্পল্‌। সেই কেস্‌ সিম্পল্‌ হওয়া সত্বেও তার বাড়ীতে সার্চ করা হয়েছে, ধোঁকা দিয়ে তাকে থানায় আনা হয়েছে, থানা থেকে এস্‌, বি, অফিস—এস্‌, বি, অফিস থেকে লালবাজার লক্‌-আপ—এইবার হয়তো এখান থেকে প্রেসিডেন্সি জেল।

ঝট্‌ করে উঠে পড়তে ইচ্ছে হয় অনাদির। কিন্তু ওই সার্চের ব্যাপারটা তো বোঝা গেল না! জিজ্ঞেস করলে, "সার্চ করে কেন?"

সুশীল বললে, "বিড়ি, দেশলাই কয়েদীদের কাছে রাখতে দেয়না।"

"কেন! বিড়ি খাওয়া কি এখানে নিষিদ্ধ নাকি?"

কিরণবাবু বুঝিয়ে বলেন, "ঠিক বিড়ি খাওয়াটা নিষিদ্ধ নয়। আসলে দেশলাই কাছে রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, ওই দেশলাইয়ের সাহায্যে হয়তো আপনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে পারেন।"

আঁৎকে ওঠে অনাদি, "আত্মহত্যা!"

"হ্যাঁ মশাই, আত্মহত্যা—" মাঝখান থেকে বলে ওঠে সুশীল, "সে কথা প্রভুরা ভালভাবেই জানেন। এখানে এলে যে ব্যবহার তাঁরা করেন, তাতে একটা মানুষের আত্মহত্যাই করতে ইচ্ছে হবে—"

চমকে ওঠে অনাদি, তারও তো বিষ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল এদের অমায়িক ব্যাবহারের চোটে! মাথা ঠিক রাখতে না পেরে সে হেমবাবুর কাছে বিষ চেয়েছিল!

সুশীল তখনও বলে চলেছে, "জানেন, জেলের কয়েদীদের কেন হাফ্‌-প্যাণ্ট পরিয়ে রাখে? আগে আগে অনেক কয়েদী সেলের মধ্যে পরণের কাপড় দিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে!"

ধীরে ধীরে উঠে পড়ে অনাদি। আর তার মনে পড়ছে, ইনটারোগেশন্ রুমে সে-ও খুঁজেছিল সমস্ত দেওয়ালটা শক্ত একটা হুক্ বা পেরেকের জন্যে! কড়িকাঠের উচ্চতাও সে লক্ষ্য করে দেখেছিল, নাগালের মধ্যে আছে কিনা! তাহলে এটা শুধু তার একার দুর্বলতা নয়! এখানকার ব্যবস্থাটাই এমন!

আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় অনাদি লোহার ফটকটার সামনে। যাক্, আত্মহত্যার কথা এখন তার ভাবনার বিষয় নয়। তার ভাবনা, মাকে চিঠি লিখতে হবে, চিণুকেও জানাতে হবে, আর সুজিত অজিতের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে মাকে সে লিখে দেবে, সুজিত আর অজিতকে গঞ্জে কোন কাজে লাগিয়ে দিতে। মামারা কারবারী লোক হলেও অবস্থা তাঁদের এমন নয় যে, তিন তিনটে লোককে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেন, তারও ওপর আবার দুজনের পড়ার খরচ জোগাবেন! তাঁদেরও তো আছে নিজের নিজের সংসার, ছেলেমেয়ে, জীবনের পরিকল্পনা।

আর নিজে সে চিঠি লিখবে সুজিত আর অজিতকে, শত অসুবিধে সত্ত্বেও লেখাপড়া তাদের শিখতেই হবে, 'মানুষ' তাদের হতেই হবে। কেনই বা পারবে না! বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জীবনীটা বার বার ভাল করে পড়তে লিখে দেবে।

কিন্তু মামারা কি রাজি হবেন! কি কাজই বা করবে বারো আর চোদ্দ বছরের দুটী কিশোর। বড়জোর গঞ্জের গুদামে বা চায়ের দোকানে 'ছোক্‌রা'র কাজ! কিন্তু মামাদের একটা সম্মান আছে, সমাজে প্রতিপত্তি আছে। বিধবা বোন আর অপোগণ্ড ভাগ্নেদের জন্যে কেনই বা তাঁরা দশজনের কাছে হেয় হতে যাবেন! না, এ ব্যাপার কখনই বরদাস্ত করবেন না তাঁরা। সে করেছিল দেশের কাজ, তার জন্যে বড়মামার ডাক পড়েছিল থানায়, তাইতেই তাঁদের মানসম্ভ্রম, পসার

প্রতিপত্তি প্রায় গিয়েছিল আর কি রসাতলে! আর তার পরিণতি আজও মনে আছে। নাঃ, গ্রামে থেকে সুজিত আর অজিতের কোন কাজ করার রাস্তা নেই!

কিন্তু কাজই বা ওরা করবে কেন! এটা তো একটা স্বাধীন দেশ! বৃটীশ তো আর নেই এখানে! তবুও কেন কচি বাচ্চারা গতরে খেটে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করার জন্যে পথে বেরোবে। ওরা এখন হাসবে, খেলবে, লিখবে, পড়বে! তা না, ওরা কাজ করবে বৈজনাথ আর রামশরনের মত, কেষ্টার মত হবে হেমবাবুর চর, কলকতার যত চায়ের দোকানের ছোকরার মত হবে রাজ্যে কুকাজের বাহন। সহসা যেন বহুদিন আগে বলা রসময়বাবুর কয়েকটা কথা ওই কারাকক্ষের মোটা মোটা দেয়াল ভেদ করে, মোটা তারের জাল আর মোটা মোটা লোহার শিক্ দেওয়া ফটক ডিঙিয়ে অনাদির কানের গোড়ার গুঞ্জন করে ওঠে, 'সে স্বাধীনতা আসেনি অনাদিবাবু! লোকচক্ষের আড়ালে, দেশের মানুষের বুদ্ধির অগোচরে ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করে যে স্বাধীনতা এসেছে, সে স্বাধীনতা আপনার আমার জন্যে নয়।'

প্রাণপণে দু'হাত মুঠো করে চেপে ধরে অনাদি, সহসা ঝাঁকানি দিয়ে ধাক্কা দেয় কারার ওই লৌহ কপাট ধরে, ফুস্ফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে, 'ঠিক বলেছিলেন রসময়বাবু—ঠিকই বলেছিলেন—'

ছট্ফটিয়ে উঠছে অনাদি। আর সে সহ্য করতে পারছে না বারান্দার পাঁচিল আর খিলানের ফাঁক দিয়ে দেখা এক টুকরো আকাশ আর গুটী দুই তারাকে! ঝপ্ করে হাতের মুঠো আলগা হয়ে যায়—পড়ে যায় মেঝের ওপর গুঁড়িয়ে যাওয়া বিড়িটা আর মুচড়ে-দুমড়ে যাওয়া দেশলাইটা। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যায় বিড়ি আর দেশলাইটা। হাতটা বাড়িয়ে চমকে ওঠে, নিষিদ্ধ বস্তু! শুধু দেশলাইটা নিয়ে উঠে

দাঁড়ায়। বিড়িটার দিকে চেয়ে ক্রুর হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, থাক ওটা ওই দরজার সামনে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত! দেখুক ওরা, ওদের আইন আমরা মানি না। যারা মানুষকে মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, তাদের আইন করার কোন অধিকার নেই।

ঝট্ করে অনাদি চলে আসে খাটের কাছে। পকেট থেকে আর একটা বিড়ি বার করে ধরায়—পর পর কয়েকটা টান দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ে। উঃ, নিষিদ্ধ! আপন মনেই গর্জে ওঠে অনাদি। এ দুনিয়ায় সবই বুঝি তার জন্যে নিষেধ! নিষিদ্ধ সুজিত আর অজিতের 'মানুষ' হওয়া! নিষিদ্ধ সৎ আর আন্তরিকভাবে জীবনকে গড়ে তোলা। নিষিদ্ধ চিণুর নিজের মতে তার সারা জীবনের সাথিকে বেছে নেওয়া—সসম্মানে সমাজের বুকে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচা। নিষিদ্ধ মায়েরও মাতৃত্বে সমুজ্জল শান্তিতে বেঁচে থাকা।

আধখাওয়া বিড়িটাকে আছড়ে ফেলে অনাদি তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। না, না, এভাবে সে কিছুতেই গুঁড়িয়ে যাবে না—এ নিষেধ সে মানবে না। তড়বড় করে এগিয়ে যায় আবার লোহার ফটকটার দিকে।

কিরণবাবু বললেন, "আলোটা নিভিয়ে দিন অনাদিবাবু..."

চমকে ওঠে অনাদি, আলোটা নিভিয়ে দেবে! ওইটুকু তো আলো—তাও নিভিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে সুইচটার কাছে এসে অতি সন্তর্পণে টিপে দেয়। ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে নিকষ কালো অন্ধকার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ঘরটাই শুধু অন্ধকার! কিন্তু বাইরে আছে আলো—আলো আছে আকাশে, রাস্তায় ঘাটে, অলিতে গলিতে—

আবার গিয়ে দাঁড়ায় লোহার ফটকটার সামনে। রাত গড়িয়ে যাচ্ছে নিশুতির দিকে। ট্রামের ঘড়ঘড়ানি কখন গেছে থেমে। কচিৎ কখনও একখানি রিক্সার ঠুংঠুং শব্দ আসছে ভেসে। মনে নেই অনাদির,

কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে লোহার ফটকটার সামনে, কতক্ষণ সে চেয়ে আছে বারান্দার পাঁচিল আর খিলানের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা সেই এক চিলতে আকাশ আর তার বুকে দুটী জলজলে তারার দিকে।

এমনই একটা সঙ্কট তো আরও একবার এসেছিল তার জীবনে। চাকরী ছিল না, রাজনৈতিক কারণে সে ছাঁটাই হয়েছিল। সে দিন-গুলোতে সে ঠোঙা বানিয়েছে, টিউশনির জন্তে দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে হেঁকে বেড়িয়েছে, দিনান্তে পাঞ্জাবীর দোকানে নগদ মূল্যের রুটীর চেয়ে বিনা মূল্যের শক্তি বেশী করে খেয়ে পেট ভরিয়েছে, কলকাতা শহরে পাঁচ টাকা ভাড়ার খোঁয়াড়ে বাস করেছে—তবুও সে সেদিন নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তারপর এল 'স্বাধীনতা'—আশা নিরাশার স্রোতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকেছিল রসময়বাবুর কাছে। তিনিই সেদিন তাকে পথ দেখিয়েছিলেন। অযথা করুণা বর্ষণ করেন নি, সারগর্ভ উপদেশ দেন নি, ত্রাণকর্তা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ান নি। এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাথি হিসেবে তার পাশে, সভায়, মিছিলে, ডেপুটেশনে, রাইটার্স বিল্ডিঙে মন্ত্রী ঘেরাও করার সময়ে।

আজ তো সে নিজেই যেতে পারে রসময়বাবুর কাছে। তিনি তো সেদিন তাকেও ডেকেছিলেন, 'আসুন অনাদিবাবু, কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এসে দুনিয়াজোড়া শোষিত মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানবতার মুক্তির জন্তে লড়াই করি।'

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল অনাদির সুশীলের ঠেলাঠেলিতে। সকালের চা আর পাঁউরুটী দিয়ে গেছে। লোহার ফটক আছে খোলা কলতলায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আসার জন্তে। বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়ে প্রথমেই অনাদি চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সমস্ত ঘরখানা। রীতিমত

বড় একখানা ঘর, বিরাট উঁচু তার দেয়াল, লোহার ফটক ছাড়া আর দুটী জানলা আছে পূবে আর পশ্চিমে। কিন্তু সেগুলো দিয়ে আলো প্রায় আসে না বললেই হয়—প্রচুর মোটা তারের অতি মিহি জাল দিয়ে সমস্ত জানলাটা মোড়া, তার ওপর ঝুল পড়ে ছিদ্রগুলোকে দিয়েছে ঢেকে!

বাইরের বারান্দায় রয়েছে তার সকালের জলখাবার। মুখ ধুয়ে ফিরে আসবার সময় নিয়ে এল চায়ের ভাঁড় দুটো আর তার মাথায় এক পিস্ করে রুটী। 'বি' ডিভিশনে দেওয়া হয় এক প্রস্থ করে—'এ' ডিভিশনে তার ডবল্। বিছানার ওপর বসে পাঁউরুটীটা মুখে তুলে হঠাৎ অনাদি হেসে ওঠে। সুশীল আর কিরণবাবু চোখ বড় বড় করে তাকান অনাদির মুখের দিকে। অনাদি বলে গতকালকার ব্রেক্‌ফাষ্টের গল্প।

কথার শেষে অনাদির নিজেরই কেমন যেন মনে হয়, সে যেন অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে। চা খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে এল। কিরণবাবু বললেন, "বিড়িগুলো আর দেশলাইটা আজ যাওয়ার সময়ে এখানে লুকিয়ে রেখে যাবেন। আজ তা বলে আর সার্চ না করে ছাড়ছে না।"

কথাটার মধ্যে কেমন যেন মজা খুঁজে পায় অনাদি। কাল রাতের অন্ধকারে সে ছিল ভাল মানুষ, মোটেই তাকে কমিউনিষ্ট বলে মনে হয়নি। কিন্তু আজ এই দিনের আলোয় তাকে কি বড্ড কমিউনিষ্ট কমিউনিষ্ট দেখাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় গত রাত্রের ভাবনাটা। হাল্কা ভাবটা আবার যেন উবে যায়। রসময়বাবুর দেখা সে কোথায় পাবে। পুলিশও তাঁকে খুঁজছে। আবার তার নতুন করে এক ভাবনা সুরু হয়। ধীরে ধীরে সে দাঁড়িয়ে ওঠে, অস্বস্তিতে সে ঘরটার ওপর চোখ বুলতে থাকে।

দেয়ালগুলোর ওপর কি যেন সব লেখা। সমস্ত দেয়াল জুড়ে পেন্সিলের আঁচড়। কোথাও কোথাও দেয়ালের গা আঁচড়ে, চূণ খসিয়ে বড় বড় অক্ষর। দেয়ালের ওপর চোখ রেখে গুটিগুটি অনাদি এগিয়ে যেতে থাকে পেন্সিল আর নখের ওই আঁচড়গুলোর দিকে।

নাম, শুধু নাম, শঙ্কর ব্যানার্জি, গঙ্গা ভট্টাচার্য, নিহার পাকড়াশি, রামচরিত সিং, মহাদেব প্রসাদ, ওয়াজিউল্লা, বজলু মোল্লা, দেবনাথ দাস, মহম্মদ জাকির—নামের যেন আর শেষ নেই। অসংখ্য মানুষের নাম, কেবল নাম, বিভিন্ন জাতের, ধর্মের, বর্ণের নাম—যেন নামের একটা মিছিল। একটার পর একটা নাম পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতে থাকে অনাদি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে। ধীরে ধীরে লেখার ধারা যেন বদলে যাচ্ছে, 'ময়দান ফায়ারিং কেস্,' কোথাও কোথাও দু এক লাইন কবিতা, 'বল বীর, চির উন্নত মম শির,' 'কারার ওই লৌহ কপাট—ভেঙে ফেল, কররে লোপাট।' আবার যেন আসছে এক নতুন ধারা—'মনে রেখ ভাই—২৯শে জুলাই'—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনাদিরও মনে আছে, অফিসে সেদিন একটা পিঁপড়েও ঢোকেনি, কলকাতার রাস্তায় একটা রিক্সাও চলেনি। সেদিন সে বাড়ীতে বসে ছুটী ভোগ করেছিল! কিন্তু ছুটীতো সেদিন সরকার দেয়নি—ছুটী আদায় করেছিল সাধারণ ধর্মঘট। পরদিন কেষ্টবাবুর সে কি উল্লাস। তিন লাখ লোকের জমায়েৎ হয়েছে ময়দানে। সেদিন অনাদি বুঝতে পারে নি, এত মানুষ এক উদ্দেশ্যে এক জায়গায় হওয়ার তাৎপর্য কি। পরে যখন বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল, তখন বেশী মানুষকে জমায়েৎ হতে দেখলে সে-ও খুশী হয়ে উঠত। কিন্তু কেন, সে কথা সেদিন সে বোঝেনি। আজ যেন মনে হচ্ছে, ওই জমায়েৎই তো সে শক্তি, যে শক্তি পারে এই ব্যবস্থাকে বদলে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে।

এগিয়ে যাচ্ছে অনাদি ওই পেন্সিলের আঁচড়ের আকর্ষণে, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই'—সায় দেয় অনাদি আপন মনেই মাথা নেড়ে, ঠিক তাই। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সে বর্বরতা যেন আর না ঘটে। 'কালা কানুন ধ্বংস হোক'—নিশ্চয়ই এখনই এর বিনাশ চাই। এ আইন না থাকলে আজ তার জীবনকে এমন ভাবে ভেঙে চুরে মিশ্‌মার্‌ করে দিতে পারত না। 'ইয়ে আজাদি ঝুটি হ্যায়'—স্বাধীনতা পাওয়ার এক বছর পরে ওই পনেরোই আগষ্ট সেই হাজরা পার্ক থেকে বেরিয়েছিল একটা মিছিল—অল্প লোকের মিছিল, তারা আওয়াজ তুলেছিল, 'ইয়ে আজাদি ঝুটি হ্যায়'—সেদিন সে-ও অন্য আরও অনেকের মত কমিউনিষ্টদের খিস্তি করেছিল, যা মুখে এসেছিল তাই বলে গালি দিয়েছিল। 'মস্কোর চর্‌', 'রাশিয়ার দালাল' 'বৃটীশের বেতনভূক্‌', কিছুই বাদ দেয়নি। আজ অনাদি ঘাড় হেঁট করে দাঁড়ায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ওই ক'টি কথার সামনে।

বিস্ফারিত চোখে অনাদি সারা দেয়াল জুড়ে সমস্ত লেখাগুলো পড়ে যায়। এ যেন এক ইতিহাস। দিনের পর দিন এসেছে জীবনের ওপর আক্রমণ—আর এ যেন সেই আক্রমণের প্রতিরোধ ইতিহাস। এ শুধু লেখা নয়, এ যেন অসংখ্য মনুষের জীবন্ত স্বাক্ষর—দুর্জয় শপথ। এই মানুষগুলোকে এরা চেয়েছিল এদের আখমড়া কলের মধ্যে ফেলে পিষে শুষে নিতে। কিন্তু নিঃশেষ হয়নি তাদের প্রাণরস। মরেনি তারা কেউ, জীবনে তাদের গর্জে উঠেছে দুর্বার প্রতিবাদ—আর দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তারা বেরিয়ে গেছে এদের এই আখমাড়া কলকে ব্যঙ্গ করে।

অনাদির বুকটা যেন ভরে ওঠে। তাহলে ঠিকই সে বুঝেছে, ঠিক পথই সে নিয়েছে। আর সে একা নয়, আরও অনেকে, অনেক মানুষের সঙ্গে সে তার জীবন দেবে গেঁথে। তাদেরও মা আছে, আছে তাদেরও ভাই, আছে প্রিয়া, আছে সুন্দর জীবনের জন্যে আকণ্ঠ পিপাসা।

বুকের মধ্যে কেমন যেন আকুলি বিকুলি করে ওঠে। ওই নামের মিছিলে সে-ও দিক তার নামটা সামিল করে। উদ্দীপ্ত মুখে সে কিরণবাবুর কাছে এসে বললে, "আপনার কাছে পেন্সিল আছে?"

"পেন্সিল।" কৌতুক অনুভব না করে পারেন নি কিরণবাবু, বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "কি হবে?"

অনাদি বললে, "লিখে দেব।"

"কি লিখবেন?"

"আমার নাম।"

কৌতুকে কিরণবাবুর চোখের তারা নেচে ওঠে, "তাই নাকি। কিন্তু ওরা যে কমিউনিষ্ট—"

ব্যগ্রতায় অধৈর্য হাতটা মেলে ধরে অনাদি বললে, "তা হোক্‌গে—"

সতেরো

স্নান, খাওয়া সেরে, এগারোটা বাজার অনেক আগেই অনাদি তৈরী হয়ে নিয়েছে। আর যেন তার তর্ সইছে না। সে স্থির জানে, কারও না কারও সঙ্গে এস্, বি, অফিসে তার দেখা হবেই। কিরণবাবু আর সুশীল চলে গেছেন ডি, ডি, অফিসে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর অনাদি একা একা সমস্ত ঘরময় পায়চারী করে বেড়িয়েছে। বারবার চেয়ে চেয়ে দেখেছে আড়চোখে তার নিজের সইটা ওই নামের মিছিলের মধ্যে।

হেমবাবু এলেন প্রায় বারোটায়। লোহার ফটক খুলে গালপাট্টা দাড়িওয়ালা সেই পুলিশটা হাঁক পাড়লে, "আইয়ে অনাদিবাবু—"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনাদি পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করে, "কাল্‌সে আপ্‌কো ডিউটী চল্‌তা ? তব্‌ ছুট্টি কব্‌ মিলতা ?"

পুলিশটা তার ডিউটী তালিকা বুঝিয়ে দেয়। গতকাল তার ডিউটী ছিল রাত আটটা পর্যন্ত, আজ তার ডিউটী সকালে আর রাতে, আগামী কাল তার পুরো ছুটী। অনাদি মনেই করতে পারে না, গতকাল ওই পুলিশটা ছিল কতক্ষণ, স্নানের জন্যে ফটক খুলেছিল কে, আর খাওয়ার সময়ই বা কে শান্তি রক্ষার জন্যে হাঁকডাক করেছিল! এ খেয়াল করবার মত মনের অবস্থা কাল তার ছিল না। কিন্তু আজ যেন নতুন চোখে দেখছে সে গালপাট্টা দাড়িওয়ালা এই পুলিশটাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় জুলিয়াস্‌ ফুচিকের কারাকাহিনী। এমনই একজন সিপাইয়ের জন্যে হিটলারী অত্যাচারকে পরিহাস করে, নিজের জীবন দিয়েও ফুচিক আজ অমর।

হেমবাবু বসেছিলেন লরিতেই ড্রাইভারের পাশে। অনাদিকে দেখেই তিনি তড়বড়িয়ে উঠলেন, "আসুন অনাদিবাবু ঝট্‌পট্‌—"

হন্‌হন্‌ করে হেঁটে এসে অনাদি লরিতে উঠে বসল। বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তার মনে পড়ে বৈজনাথ আর রামশরণকে। কিন্তু আজ তারা আসেনি—এসেছে অন্য দু'জন, প্রায় তাদেরই সমবয়সী। অনাদির মনে পড়ে যায়, বৈজনাথ আর রামশরণের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে আনা সেই পনেরোজনের কথা—তাদের মধ্যে এরাও বোধহয় আর দুজন!

গাড়ী চলতে সুরু করে। অনাদির মনের মধ্যে বৈজনাথের গল্প ভেসে চলতে থাকে, 'গ্রামে তারা থাকত। ক্ষেতিবাড়ীতে আনাজ তেমন আর হয়না। যা-ওবা কিছু হয়, দিতে হয় জমিদারকে। সংসারে অনাটন। বড়ভাই মজদুরী করতে শহরে চলে এসেছে তিন সাল আগে। নোক্‌রী তার মাঝে মাঝে হয়, আবার ছুটেও যায়। ঘরে

টাকা সে ভেজতেই পারেনা। কাজেই তারাও দেশছাড়া হওয়ার কথা ভাবছিল। এমন সময়ে ট্রেণিঙের হাবিলদার সাহেব যান গ্রামে। পাশের গ্রামের আদমী তিনি। আগল্‌বগল্ দু'তিনটী গ্রামের পনেরো-জনকে এনেছেন তিনি ট্রেণিং দেবেন বলে।'

কেবল একজন হাবিলদারই কি পনেরোজনকে সংগ্রহ করে এনেছে! আছে তো আরও হাবিলদার সাহেব, আর বিভাগে বিভাগে আড়কাঠি, তারা লোক সংগ্রহ করছে পুলিশের জন্যে, চা-বাগানের জন্যে, মিলিটারীর জন্যে, এমন কি বিদেশে চালান দেওয়ার জন্যেও! আর গ্রাম থেকে লোক ধরে আনবার জন্যে আড়কাঠিই বা লাগবে কেন! সে-ও তো এসেছে গ্রাম থেকে শহরে। তারও তো বৈজনাথ আর রামশরণের মত একই ইতিহাস! তার ঠাকুর্দার ছিল জমিজমা, বাবার সময়ে ফুরিয়ে যেতে লাগল, বাবা মারা যাওয়ার পর সে সর্বস্বান্ত। এইবার আসবে সুজিত আর অজিত, হয়তো আনতে হবে মা-কে, তারপর হয়তো চিনুও চাইবে আসতে। কাজ করবে তারা এখানে, কিন্তু সে কাজও ছুটে যাবে মাঝে মাঝে। আজ বেকার—কাল কাজ, এমনি করেই একটা নড়বড়ে জীবন তারা কাটিয়ে যাবে পুরুষানুক্রমে। দেশে যাওয়ার মত উদ্বৃত্ত পয়সা হাতে আসবে না কোনদিনই, কিন্তু মনটা পড়ে থাকবে গ্রামের সেই সোনার ক্ষেত আর শান্তির নীড়টীর পানে। শহরে বাস করেও পূর্ববঙ্গের লোক হিসেবে সে হবে 'বাঙাল্', পশ্চিম বঙ্গের লোক হবে 'ঘটি', বৈজনাথ আর রামশরণ হবে 'ছাতুখোর', আর সবার উপরে আছে হিন্দু-মুসলমান! ছ'টুকরো হয়ে যাচ্ছে 'বাঙাল', 'ঘটি', 'ছাতুখোর'ও! এ যেন সেই আদিম বর্বর যুগের ব্যবস্থা—খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট দলে মানুষগুলো বাঁচার জন্যে যাযাবরের জীবন যাপন করে চলে, কিন্তু একটা দল অপর দলের মুখোমুখি হলেই লড়াই শুরু করে দেয়—যেন তারা উভয়েই উভয়ের চরম ও পরম শত্রু!

এমন নিবিড় করে অনাদি কোনদিনই চিন্তা করেনি। এমনতর মুহূর্তে তারও মনে পড়ে সোভিয়েট দেশের কথা! কমিউনিষ্টদের মুখে বারম্বার সোভিয়েটের কথা শুনে তারও রাগ হত—সে-ও বিশ্বাস করত, সত্যিই বুঝি কমিউনিষ্টরা সোভিয়েটের চর। কিন্তু আজ অনাদি নিজের বাঁচার আকাঙ্খা থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণ করে সোভিয়েটের নতুন জীবন, নতুন ব্যবস্থার কথা। সেখানে গ্রামগুলো উজাড় হয়ে যাচ্ছে না। গ্রামগুলোই হয়ে উঠছে শহর! গ্রামের মানুষের জুটছে গ্রামে বসেই গ্রাসাচ্ছাদন। গ্রামেই তাদের জীবন হচ্ছে উন্নত, সেখানেই গড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, নার্সারী, হাসপাতাল, সিনেমা, থিয়েটার। যে যার নিজের ভাষায়, নিজের আচার ব্যবহারে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়েই হয়ে উঠছে উন্নত, স্বয়ং সম্পূর্ণ।

হঠাৎ লরিখানা ঘ্যাচ করে থেমে যায়। চমকে ওঠে অনাদি, এরই মধ্যে পৌঁছে গেল এস্, বি, অফিসে। আপনা হতেই উঠে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু, না তো। এ তো রাস্তা। আশপাশ দেখে নিয়ে বুঝতে পারে, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট। ওয়েষ্টন স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম লাইনের ওপর দুটো ষাঁড় লড়াই সুরু করেছে—মাথায় মাথা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। দু'ধারে ট্রাম, মোটর, লরি, এমন কি ঠেলাগাড়ী, রিক্সাও গেছে দাঁড়িয়ে—আর মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে কাতারে কাতারে। হেমবাবু ছট্‌ফট্ করছেন দেরী হয়ে যাওয়ার জন্যে। কিশোর সিপাই দুটী মহা কৌতূহলে দাঁড়িয়ে উঠেছে, অপার বিস্ময়ে দেখছে ষণ্ডপুঙ্গবদের দাপট্। আসামীর ওপর নজর নেই কারও।

অনাদির মনে একটা ঝলক দিয়ে ওঠে, এই অবসরে সে যদি পালিয়ে যায়। পাশেই ওয়েষ্টন স্ট্রীট—ও রাস্তাটা সে চেনে। দশ হাত অন্তর অন্তর গলি, আর সে গলিতে ঢুকলে দিনের বেলাতেও গা ছম্‌ছম্

করে। যদি একবার কয়েক মিনিটের জন্যে সে এদের চোখের আড়াল হতে পারে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা শিবেরও অসাধ্য।

কাগজে পড়া ঘটনাগুলো একটার পর একটা অনাদির চোখের ওপর ভেসে ওঠে। দমদম রোডের ওপর জেলভ্যান্ থেকে পালিয়ে গেছে চারজন কমিউনিষ্ট। একদল লোক এসে গাড়ীর পথ রুখে দাঁড়ায়, আর তাদেরই সাহায্যে পুলিশদের ঘায়েল করে তারা হয়ে যায় উধাও। এই তো সেদিন, বিহারের কি যেন একটা স্টেশনে পাঁচশো লোকের এক জনতা তাদের নেতাকে পুলিশ বেষ্টনী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তবে সেই বা কেন না পালিয়ে যাবে এমন সুযোগ পেয়েও। জেলের মধ্যে আটক থেকে কেনই বা সময়ের অপচয় করবে। কাজতো সে এখনই সুরু করতে পারে। নিঃসাড়ে উঠে দাঁড়ায় অনাদি। গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ডিং মেরে জনকতক লোক মজা দেখছিল। অনাদি দাঁড়িয়ে উঠতেই তারা সমস্বরে হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল, "এই বাবু- বৈঠ যাও—"

ফ্যাকাশে মুখে অনাদি বসে পড়ে, নাঃ, তার পালান চলে না। সে একা, এই এতগুলো মানুষের তাকে কোন প্রয়োজন নেই। এই কলকাতা শহরে তার তিন বছরের জীবনে সে একটা মানুষের কাছেও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবে, পালিয়ে সে যাবে কোথায়!

গতকাল সকালে তারই বাড়ীর সামনে অনেক মানুষের সেই জমায়েৎটা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। তারা জানতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, তারা জানতে চেয়েছিল কেন তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শত আঘাত খেয়েও ঘটি, বাঙাল, ছাতুখোর, হিন্দু, মুসলমানে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি। তারা গতরে খাটে, তাদেরও সংসার

আছে, আছে কাজ—তবুও তারা একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্তি বোধ করেনি। কিন্তু তাদের তো সে কাছে ডাকেনি, বলেনি কিছুই। কেষ্টবাবুর কথা মনে করে নিজের মনের মধ্যে গুমরে মরেছে, কিন্তু ওই মানুষগুলোকে জানায়নি তার অবস্থা, তার মনের কথা—কোন আস্থাই তার ছিলনা ওদের ওপর।

কিন্তু রসময়বাবু আজ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, মানে ওই মানুষগুলোর জিম্মায়। তাঁর জন্যে অসংখ্য দ্বার আজ উন্মুক্ত, তিনি তাদের লোক, তাদের বেঁচে থাকার স্পন্দন, তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক, তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই রসময়বাবুর অভাব হয় না নিরাপদ আশ্রয়ের, তাঁর নিরাপত্তার জন্যে হাজার জোড়া চোখ সদাই সজাগ দৃষ্টি মেলে আছে হন্যে পুলিশের গতিবিধির ওপর।

এস্, বি, অফিসের লক-আপ্ রুমে ঢুকে অনাদি খুশী হয়ে ওঠে। ঘর আজ জমজমাট। নতুন আসামী আমদানি হয়েছে দুজন। রামশরণ আর বৈজনাথ মহা আনন্দে গল্প জুড়ে দিয়েছে ওঁদেরই একজনের সঙ্গে।

অনাদি গিয়ে বসে ভাঙা তক্তাপোষটার ওপর। নতুন আসামীর মধ্যে একজন শুয়ে আছেন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। চট্ করে অনাদির মনে হয়, ওঁর অবস্থাটা বোধহয় তারই মতন। কাল সে-ও শুয়ে পড়েছিল।

অপর জন বসে আছেন মাটীতে পা দুটো রেখে, হাঁটুর ওপর কণুইয়ের ভর দিয়ে। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে তিনি কুতুহলি রামশরণ আর বৈজনাথকে বলছেন, "হামরা সব্ রাজ হোগা, তব্ বাচ্চা রহেগা বাচ্চাকো মাফিক ঔর জোয়ান করেগা জোয়ানকা মাফিক কাম্।

হামারা রাজমে তুম্‌রা মাফিক বাচ্চালোগ্‌ জোয়ানকা মাফিক কাম করণেকে লিয়ে মজবুর্‌ নহি হোগা। তুম্‌রা মাফিক বাচ্চালোগোঁকো কাম্‌ হোগা লিখ্‌না, পড়না, খেল্‌না, কুদ্‌না—"

গুম্ফরেখাহীন রামশরণ আর বৈজনাথের কিশোর মুখ দুটীতে সরল চোখদুটী নেচে ওঠে খুশীতে। রামশরণের চোখ দুটো করুণ হয়ে চক্‌চক্‌ করে ওঠে, আর বৈজনাথ বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে বলে ওঠে, "হাঁ, ওইসাই তো হোনা চাহি—"

অনাদিরও মনে পড়ে যায়, গত রাতে সে-ও সুজিত আর অজিতের কাজের কথা ভাবতে গিয়ে ওই একই কথা ভেবেছে। নতুন আসামী সূর্যর আরও একটু কাছ ঘেঁষে বসে অনাদি। রামশরণ অনাদিকে জিজ্ঞেস করে, "ক্যা বাবু, সব ঠিক হায় তো?"

ঘাড় নেড়ে অনাদি জানায়, "হাঁ।"

সূর্য অনাদিকে বলে, "ও, আপনি বুঝি ইতিমধ্যেই পুরণো হয়ে গেছেন?"

"আমি কাল এসেছি।"

"আপনি কোন এলাকার?"

প্রশ্নটা সঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনাদি। কুণ্ঠিত স্বরে সূর্য বলে, "মাপ করবেন, আমি একটু ভুল আন্দাজ করেছিলাম।"

অনাদির মন প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু ঘর ভর্তি লোক। আমতা আমতা করে বললে চাপা গলায় সূর্য কানের কাছে মুখ এনে, "ভুল আপনি করেননি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন কাজ করিনি বলে আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি—"

অনাদির হাতের ওপর একটা হাত রেখে সূর্য বললে, "তাহলে আপনি আমাদেরই লোক?"

"হ্যাঁ"—বলে অনাদি ঝট্ করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। চোখদুটো তার কেমন যেন জ্বালা করে উঠেছে, বুঝিবা একফোঁটা জল এখনই টপ করে ঝরে পড়বে তার চোখ থেকে।

বৈজনাথ রামশরণের হাতে একটা চিমটি কেটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে গিয়ে ওরা ওদের কাজে বসে যায়, বৈজনাথ কাটে ন্যাথবন্দীর ঘর আর রামশরণ সাজায় ঘুঁটি।

গতকালের কথা একে একে মনে পড়তে থাকে অনাদির—সে যেন এক ইতিহাস! একদা এক অনাদিকে ধরে এনেছিল স্বাধীন ভারতের পুলিশেরা…

সূর্যর আরও কাছ ঘেঁষে এসে অনাদি বললে, "কাল ছাত্রনেতা আনোয়ারকে এনেছিল, আর এনেছিল হরিশকে—"

মুহূর্তে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ওঠে সূর্যর মুখখানা, ভ্রু দুটো কুঁচকে যায়, কপালের রেখাগুলো ফুটে ওঠে গভীর হয়ে। অন্যমনস্ক অবস্থায় প্রশ্ন করে, "তার-পর ?"

তারপর অনাদি বলে যায় একে একে আনোয়ারের সমস্ত ব্যাপারটা, হরিশের ব্যাপারের আদ্যোপান্ত। সূর্য বললে, "আপনার কথা তো কিছু বললেন না ?"

সসঙ্কোচে বলে অনাদি, "আমার কথা আর কি বলব! আমি তো কিছুই করিনা—"

"তবুও আপনাকে ধরে এনেছে—" গর্জে ওঠে সূর্য, "আর এরা বলে, আমরা করছি হিংসাত্মক কাজ। আমরা চাই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা অরাজকতা সৃষ্টি করতে। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ওরা চাইছে ওদের মসনদ নিরঙ্কুশ করে তোলার জন্যে আমাদের গলা টিপে জনতার স্বরকে রুদ্ধ করে দিতে।"

অনাদি বলতে সুরু করে তার সমস্ত ব্যাপার। বলতে বলতে কখন

সে বলে চলেছে তার মনের ওপর প্রতিটী ঘাত প্রতিঘাতের কথা, এমন কি তার নতুন পরিকল্পনার কথাও—

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সূর্য প্রতিটী কথা শুনে যায়। অনাদির কথা শেষ হলেও সূর্য চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, কপালের রেখাগুলো কুঁচকে থাকে অনেকক্ষণ। গভীর আবেগে অনাদির হাতখানি তার দুটী হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলতে থাকে সূর্য, "এমনই একটা জীবন আমরা চেয়েছি অনাদিবাবু। ছোট্ট একটী সংসার, সাজান গোছান, অভাব অনাটন থাকবে না, মানুষে মানুষে থাকবে গভীর প্রীতি, বুকভরা ভালবাসা। স্ত্রী পুত্র জীবনের আনন্দ হয়ে উঠবে, ভাই বোন স্নেহে ভালবাসায় উছলে পড়বে, পাড়া-প্রতিবেশী হবে অন্তরঙ্গ সুহৃদ। কিন্তু কি আমাদের জীবন। স্ত্রী পুত্রকে মনে হয় দুর্বহ বোঝা, ভাই বোনকে মনে হয় দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়, আর প্রতিবেশী যেন ভাগাড়ে শকুণ। কেন মনে হয় জানেন, কারণ আমাদের কারও জীবনে নেই স্থিতি, নড়বড়ে একটা জীবন প্রতি মুহূর্তেই ভেঙে পড়ছে, খসে পড়ছে, ঝরে পড়ছে। প্রভু আর ভৃত্যে সমাজটা আমাদের বিভক্ত। প্রভুর দল চাইছে অফুরন্ত লাভ, অপরিসীম তাদের লোভ, সমস্ত দুনিয়াটাকে তারা চেটেপুটে পেটে পুরতে চায়। আর আমরা, যারা সোনার ধান ফলাই, গড়ি ইমারত, সমাজের জীবনকে যারা ধারণ করি মুঠোর মধ্যে—সেই আমরাই হয়েছি ভৃত্য। কারণ, আমরা এখনও খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। তাই ওরা আজ রাষ্ট্রের গদিতে, আমাদের ভাগ্যবিধাতা। এমন অবস্থার মধ্যে জীবনকে গড়ে তোলা যায় না অনাদিবাবু—কোন পরিকল্পনাকেই সফল করা সম্ভব নয়, সে পরিকল্পনা যতই ক্ষুদ্র আর সাধারণ হোক্। তাই আজ আমাদের জীবনে একটী মাত্র পরিকল্পনাই থাকা উচিত—সে হচ্ছে বিপ্লবকে সফল করা—তারই জন্যে লড়াই করা, তাঁরই জন্যে বাঁচা, তারই জন্যে প্রাণ দেওয়া।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অনাদি চেয়ে থাকে সূর্যর মুখের দিকে। সূর্যর চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে, মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি তার বিস্ফারিত চোখ থেকে হুহু করে নেমে আসবে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। অনাদি দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে থাকে সূর্যর কম্পমান হাতখানা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চিন্তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সূর্য বললে, "যাক্, এখন বলুন তো, আমাদের এই অজয়বাবুকে নিয়ে কি করা যায়?"

অজয়বাবু অর্থাৎ নতুন অসামীদের দ্বিতীয় জন। অনাদি এসে পর্যন্ত তাঁকে সেই একই ভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছে। জিজ্ঞেস করলে, "কেন। ওঁর কি হয়েছে?"

দপ্ করে সূর্য যেন জ্বলে ওঠে, "কি হয়েছে? ভাবতে পারেন, এরা কত হিংস্র। আর অহিংসার নামাবলি চড়িয়ে এরাই আমাদের হিংসাত্মক পন্থার ঢাক পিটিয়ে চলেছে। ইনি এডওয়ার্ড ডেভিড্ কোম্পানির একজন কেরাণী—ওঁদের ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য। ওঁরা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ভাবে কোম্পানিকে ষ্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছেন। ব্যাস্, অমনি ছুঁচো টিকটিকি, সিপাই শান্ত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমাদের জাতীয় সরকার—মানুষের মত যারা বাঁচতে চায় সেই 'হিংসাপন্থি' মানুষগুলোকে ধরে আনতে। কোম্পানিটা কিন্তু বৃটীশ মালিকের, যাদের হঠিয়ে আমরা নাকি স্বাধীনতা পেয়েছি! আর এ ভদ্রলোক কিন্তু কমিউনিষ্ট নন, ঘোরতর কমিউনিষ্ট বিরোধী—উনি একজন সোশ্যালিষ্ট। কাল ওঁদের ষ্ট্রাইক। আজ রাত চারটের সময় ওঁর বাড়ীতে হানা দিয়েছে। ওঁর স্ত্রী ভুগছেন টি, বি'তে আজ তিন মাস, তাঁর ঘরটাও এঁরা বাদ দেন নি। স্ত্রীকে দেখাশুনা করার উনিই একমাত্র লোক। তবুও ওঁকে আপনার মত ধোঁকা দিয়ে নিয়ে এসেছে থানায়। তারপর আর কি। খপ্পরে তো পেয়ে গেছে—নিয়ে এসে

হাজির করেছে এখানে। অন্তত ষ্ট্রাইকটা বান্‌চাল্ না হওয়া পর্যন্ত আর ছাড়ছে না ওঁকে—"

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে অনাদি চিৎকার করে ওঠে, "আর ওঁর স্ত্রী ?"

"তিনি ? তিনি মরে যাবেন মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে উঠতে। তাতে কারই বা কি ক্ষতি হবে অনাদিবাবু। এড্‌ওয়ার্ড ডেভিড্ কোম্পানির বিলাতি মালিককে তো আর শ্রমিক কর্মচারীর মাইনে বাড়াতে হবে না। তার মুনাফা থাকবে অটুট, উপরন্তু এঁদের 'অবাঞ্ছিত' নাম দিয়ে ছাঁটাই করতে পারবে নির্বিবাদে—ওঁর কাজটা চালিয়ে নেবে আর দুজনের ঘাড়ে চাপিয়ে হুমকি দিয়ে! মুনাফা আরও বাড়ল, অটুট মুনাফা ফুলে ফেঁপে সোনার পাহাড় হয়ে উঠবে—চালান হবে সাত সমুদ্দুর তেরো নদির পারে। ভারতের মহান ঐতিহ্য বজায় থাকবে—ভালবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করা হবে, আর বৃটীশ মূলধন যারা বাজেয়াপ্ত করতে বলে, তাদের 'বিদেশীর চর' বলে ঢাক পেটান যাবে। এত বড় এক মহান আদর্শের জন্যে যদি অজয়বাবুর স্ত্রী মরে যান, তাতে তো ত্যাগের মহিমাই বাড়বে। যদি হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়, তাতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার সুযোগই বাড়বে।"

অনাদির সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তার মাথায় উঠে চন্‌মন্ করছে। সূর্যর কথাগুলো যেন ছবির রূপ নিয়ে তার চোখের ওপর দিয়ে ছায়া-ছবির মত ভেসে চলেছে। অনাদি যেন দেখতে পাচ্ছে, অজয়বাবুর স্ত্রী ঘরে একা, কেউ নেই তাঁর পাশে, বমি করছেন তিনি ঝলকে ঝলকে ; টাটকা, তাজা, ঘন রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত ঘরটা। তারপর হঠাৎ থেমে গেল কাশি, বমি, ঝুলে পড়ল একটা হাত বিছানার পাশ দিয়ে, মাথাটা খসে পড়ল বালিশ থেকে। সমস্ত নিরব, নিথর, কেবল তাঁর কপালের ওপর ফুটে উঠেছে বড় বড় মুক্তোর মত একরাশ ঘাম। তাঁর পাশে এমন কেউ নেই যে, ওই মুখখানির দিকে

শেষবারের মত একবার চেয়ে দেখে—গায়ের চাদরটা দেয় মুখের ওপর টেনে।

ঝপ্ করে অনাদি উঠে পড়ে তক্তাপোষের ওপর থেকে। অজয়বাবুর কথা চিন্তা করতে গিয়ে ভেসে উঠেছিল তার চোখের ওপর চিণুর মুখখানা। আর ঘরটা যে তারই! তারই ওই নড়বড়ে তক্তাপোষের তলা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

সূর্যর মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে, "অজয়বাবুকে মুক্ত আমাদের যে কোন উপায়েই হোক করতেই হবে সূর্যবাবু।"

মুখ তুলে সূর্য বললে, "হবেই তো।"

আঠারো

অনেক টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত হেমবাবু এনে দিলেন এক টুকরো কাগজ আর কালি কলম। অজয় তাঁর সামনে বসেই দরখাস্ত লিখলে, যেমন যেমন সূর্য বলে গেল। আজ আর অনাদির ভয় করে না সূর্যর জন্যে, যেমন ভয় করেছিল গতকাল হরিশের জন্যে।

অজয়ের স্ত্রীর অসুস্থতার বিবরণ দিয়ে দাবি করা হল, হয় তাকে তখনই ছেড়ে দেওয়া হোক তার স্ত্রীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে, নয়তো পুলিশ বিভাগ তার স্ত্রীর যাবতীয় ভার নিক। উপরোক্ত মর্মে ব্যবস্থা হওয়ার আগে অজয়ের স্ত্রীর যদি মৃত্যু ঘটে, তার জন্যে দায়ী হবে পুলিশ বিভাগ। এই দরখাস্তের মেয়াদ সেই দিনেরই বেলা তিনটে পর্যন্ত। তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা না হলে সে অনশন ধর্মঘট করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হবে।

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে হেমবাবু উঠে দাঁড়াতেই অনাদি বললে,

"দেখুন হেমবাবু, ডি, সি'কে এ কথাও জানাবেন, ওই দরখাস্ত মঞ্জুর না হলে আমরাও অজয়বাবুর মত একই পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হেমবাবু, "আপনি আবার এসব হাঙ্গামার মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছেন কেন অনাদিবাবু। আপনার কেস্‌টা ছিল খুবই সিম্পল্—হয়তো আজ কিংবা কাল ছাড়া পেয়ে যেতেন।"

উদ্ধত হয়ে ওঠে অনাদি, হেমবাবুর এ দরদী সুর তার কাছে প্রচণ্ড অপমানকর, মুখ চোখ লাল করে বললে, "আমাকে ছেড়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে একজন অসহায় মহিলাকে আপনারা খুন করতে চান?"

ঝপ্ করে সূর্য উঠে দাঁড়ায়। অনাদিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হেমবাবুকে বলে, "অযথা তর্ক করে লাভ নেই হেমবাবু, এটা হল আমাদের পক্ষের কথা। আপনি জানিয়ে দেবেন সমস্তটাই ডি, সি'কে, সেইটাই হল আপনার কাজ। চাকরীটা আপনার কোন রকমে বজায় রাখা নিয়ে কথা তো।"

কেমন যেন কাষ্ঠহাসি হাসেন হেমবাবু, "তাতো বটেই—তাতো বটেই—তবে কিনা—"

"চাকরীর উন্নতী—" কথাটা যেন তুলে নেয় সূর্য হেমবাবুর মনের মধ্যে থেকে, "কাজ দেখিয়ে হয়না হেমবাবু। উন্নতী হয় মুরুব্বি পাকড়ে, খোসামোদ করে, সহকর্মিদের নামে লাগিয়ে ভাঙিয়ে—"

হেসে ওঠেন হেমবাবু হো হো করে, "তা যা বলেছেন—তা যা বলেছেন—" হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যান তিনি।

সূর্য বসে পড়ে তক্তাপোষটার ওপর, অনাদির হাত ধরে টেনে তাকেও বসিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে বলে, "শুধু উত্তেজিত হওয়ার কাজ নয় অনাদিবাবু। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে। হেমবাবুর ওপর রাগ দেখিয়ে, ঝাল ঝেড়ে আপনার কোন কাজ হবে না। উনি নিছক চাকুরে, চাকরীতে উন্নতী

করার সাধ কার না হয়। ভেবে দেখুন তো, আমরা যেখানে চাকরী করেছি, সেখানে আমরা এঁদের মতন দুর্ব্যবহার করেছি কিনা। এদের ব্যবস্থাটাই এমন, যাতে দুর্ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, সাধারণ মানুষের ওপর আক্রোশ সৃষ্টি হয়। কাজেই, লড়াইটা আপনার এই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে—কোন একটী অফিসার বা কেরাণী বা সিপাইয়ের বিরুদ্ধে নয়। সেই জন্যেই আপনাকে চলতে হবে এমন ভাবে, যাতে এরাও বুঝতে পারে যে এ ব্যবস্থার মধ্যে জীবনে উন্নতী করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সুখে স্বচ্ছন্দে চলার মত একটা জীবনকে গড়ে তোলা।"

গতকালের সেই ইনফরমারবাবু দরজার গোড়ায় এসে বললেন, "চলুন অনাদিবাবু—"

কেমন যেন বিস্ময় জাগে অনাদির, এ লোকটা আবার কেন! জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় ?"

"আই, বি, অফিসে ইনটারোগেশনের জন্যে—" বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন ইনফরমারবাবু।

সূর্য বলে ওঠে, "নাঃ অনাদিবাবু, হেমবাবু সত্যিই আপনার শুভাকাঙ্খি। পাছে আরও ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে দিচ্ছেন সরিয়ে—"

উঠে দাঁড়ায় অনাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও উঠে দাঁড়াল। গলার স্বর নামিয়ে সূর্য বললে, "আর বোধহয় আপনার সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে অনাদিবাবু—হয়তো আমাকে এখনই চালান করে দেবে। তবে, অজয়বাবুর মুক্তির প্রতিশ্রুতি আদায় না করে আমি এখান থেকে নড়ছি না। যদি জোর করে নিয়ে যায়, জেলের মধ্যে অজয়বাবুর মুক্তির দাবিতে অনশন ধর্মঘট চালাবার আশা রাখি। কিন্তু অজয়বাবুর স্ত্রীকে বাঁচানর প্রধান দায়িত্ব এসে পড়েছে আপনার ওপর। এদের এই ঘাঁটির মধ্যে

আন্দোলনের ভার রইল আপনার ওপর। অনশন ধর্মঘট যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে চেষ্টা করবেন লালবাজার লক্-আপ্-এর আর সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে করতে। আর সর্বত্র, প্রতিটি মানুষের কাছে অজয়বাবুর অবস্থার কথাটা জানাবেন।"

খপ করে অনাদি সূর্যর একটা হাত চেপে ধরল, তবুও তার হাতটা কাঁপছে থর্থর্ করে। আরও জোরে চেপে ধরল অনাদি সূর্যর শক্ত হাতখানা তার দুটী হাতের মধ্যে। কি একটা যেন সে বলতে যায়, কিন্তু গলাটা যেন গেছে বুজে। এক ঝলকে খানিকটা জল এসে চোখ দুটোকে দিলে ঝাপসা করে।

সূর্য বললে, "উত্তেজিত হবেন না অনাদিবাবু, আবার আমাদের দেখা হবেই—অনেক লড়াই যে এখনও বাকী। আজ তো আমরা মহা ভাগ্যবান, আমাদের মাথার ওপর রয়েছে সোভিয়েট আর নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলো—মুক্তি পেতে চলেছে আমাদের প্রতিবেশী চীন, আর সবার ওপরে সূর্যের দীপ্তি নিয়ে রয়েছেন কমরেড স্তালিন। জীবনের জয়যাত্রা আজ দুর্মদ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দেশে দেশে। জয় আমাদের হবেই।"

হাত ছেড়ে দিয়ে অনাদি এগিয়ে যায় এক ধাপ দরজার দিকে। লম্বা পা ফেলে সূর্য তার নাগাল ধরে নিয়ে বললে, "বাড়ী থেকে আমার জন্যে জামা কাপড় দিয়ে যাবে, সেগুলো রেখে যাব হেমবাবুর কাছে—মনে করে চেয়ে নেবেন। আমার তো মনে হচ্ছে, দিন সাতেক পরে আপনি ছাড়া পাচ্ছেন। যাবেন কিন্তু আমার বাড়ীতে, আর ওইখান থেকেই আপনার যোগাযোগ হয়ে যাবে।"

আর যেন অনাদি সূর্যর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—ছুটে বেরিয়ে যায়। ইনফরমারবাবুর কাছে গিয়ে বলে, "চলুন—"

ইনফরমারবাবু চোখ পাকিয়ে অনাদির মুখের দিকে ক্ষণেক চেয়ে

থেকে বলে ওঠেন, "ব্যাপ্‌টাইজড্‌ হয়ে গেলেন তো।" উত্তরের অপেক্ষা না করেই পা চালিয়ে দেন, আপন মনেই বিড়বিড় করে ওঠেন, "সাংঘাতিক লোক এরা মশাই—"

আই, বি, অফিসের খুপরি ঘরটার মধ্যে ঢুকে ধপাস্‌ করে বসে পড়ে অনাদি একটা চেয়ারের ওপর। ইনফরমারবাবু নানান গল্প জুড়ে দেন—আজকের দিনের দুঃখ কষ্টের, নানাবিধ অসুবিধের। তারপর কখন যেন কথার মোড় ঘুরে যায়, কমিউনিষ্টদের বীরত্বের, একনিষ্ঠতার প্রশংসায় হয়ে ওঠেন পঞ্চমুখ—"কিন্তু সে কমিউনিষ্ট পার্টি আর নেই—ভেজাল মিশে গেছে মশাই, প্রচুর আজেবাজে লোক ঢুকে পড়েছে পার্টির মধ্যে, তা না হলে সমস্ত খবর আমরা পাই কি করে।"

অলস দৃষ্টিতে অনাদি চোখ তুলে চায় ইনফরমারবাবুর দিকে। লোকটার অসহায় ভাব আর পর্বতপ্রমাণ নির্বুদ্ধিতা দেখে সত্যিই করুণা জাগে। হেসে বলে, "কেন অযথা আয়ুক্ষয় করছেন দাদা—আমি তো কমিউনিষ্ট পার্টির কিছুই নই।"

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন ইনফরমারবাবু, তবুও বলেন, "তা কখনও হয়, ও ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব তো কথা কইছিলেন।"

বিরক্তি চাপতে না পেরে অনাদি বলে ওঠে, "কথা তো আমি আপনার সঙ্গেও বলছি, তার মানে, আমিও কি একজন টিকৃটিকি হয়ে গেছি নাকি?"

অপমানটা বোধহয় গায়ে বেঁধে ভদ্রলোকের, মুখখানা কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে যান। যাওয়ার পথে দরজাটাকে ভেজিয়ে দেন।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে অনাদি পা দুটো ছড়িয়ে দেয়, মাথাটা হেলিয়ে দেয় চেয়ারের ওপর। অবাক লাগছে তার নিজেকে নিয়ে! বাড়ী ফেরার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাড়ী বলতে শুধু তার নিজের ঘরটাকেই মনে পড়ছেনা, মনে পড়ছে বাড়ীর প্রতিটি বাসিন্দার

কথা, বিশেষ করে তার চোখের ওপর বার বার ভেসে উঠছে শান্তশিষ্ট বৌটীর মুখখানা, যখন তিনি তাকে বলেছিলেন চা খেয়ে যাওয়ার জন্তে অপেক্ষা করতে! থানা ইন্সপেক্টর অবনীবাবুর নাল-লাগান বুট ঠোকার শব্দ, কোমরে ঝোলান রিভলভার, মাথার ওপর উদ্ধত হেলমেট্—কোন কিছুই কি তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারেনি! পুলিশের গোঁসা হতে পারে, একথা তিনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিলেন, তবুও তিনি বিচলিত হননি! বসবার জন্তে তাকে একটা আসন পেতে দিলেন, চা ঢাললেন ধীরে ধীরে, তু'স্লাইস্ রুটীতে মাখন লাগালেন বেশ পুরু করে, তারপর প্লেটে করে এগিয়ে দিলেন তার সামনে! ব্যস্ততার কোন লক্ষণইতো ছিল না তাঁর কাজে কর্মে।

মাত্র একদিন আগেকার ঘটনা। তখন তার কেমন লেগেছিল, কি মনে হয়েছিল, কিছুই যেন সে মনে করতে পারছে না এখন। আসলে তখন সে কিছুই অনুভব করতে পারেনি। জীবনের ওপর ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে সে হয়ে পড়েছিল দিশেহারা! কিন্তু এখন যেন অনাদি অনুভব করতে পারছে, শান্তশিষ্ট বৌটীর মনের কথা। ওটা তাঁর তার মত এক ব্যক্তির প্রতি করুণা নয়—পুলিশের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর সে প্রতিবাদ এমনই দুর্জয় যে অবনীবাবু, ক্ষিতিশবাবু আর তাঁদের বাহিনী মাথা নিচু করে 'গরুচোরে'র মত ছিল দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না শান্তশিষ্ট বৌটী তাকে ছেড়ে দেন! অনুশোচনায় আর লজ্জায় অনাদির মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। চা, রুটী খাওয়া শেষ করে উঠে আসার সময়ে ওই মানুষটীর সঙ্গে সে একটা কথাও বলে আসেনি! এমনই অন্ধ সে হয়ে পড়েছিল!

ধীরে ধীরে খুপরিটার দরজা খুলে নতুন একটা মুখ প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে। অনাদি সোজা হয়ে বসে। নতুন ভদ্রলোক নধর চেহারাটী নিয়ে অতি সন্তর্পণে এসে বসলেন চেয়ারটীতে। চুড়িদার পাঞ্জাবীর

আস্তিনটা ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়ে, টেবলের ওপর জোরে জোরে কয়েকবার ফু দিয়ে রাখলেন কণুই দুটো টেবলের ওপর অতি আলগোছে। তাতেও যেন স্বস্তি হয় না, নাকটা ওঠে সিঁটকে, ঠোঁট যায় উল্টে। ব্যাজার মুখে হাঁকলেন "দরোয়াজা—"

রামশরণ এল। ভদ্রলোক বললেন, "টেবল্ সাফ করো—"

রামশরণকে দেখে মনে পড়ে যায় অনাদির, একটা কথাও সে আজ বলেনি তার সঙ্গে। কেমন যেন বেদনা জাগে মনে। রামশরণের কাজ শেষ হলে অনাদি বললে, "হেমবাবুসে পয়সা লেকে হামারা লিয়ে চার পয়সাকে বিড়ি ঔর একঠো ম্যাচিস্ লা দেও—"

হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন নশ্বরকান্তি ভদ্রলোক, "বেশ তো, ততক্ষণ না হয় একটা সিগারেটই খান—" পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট আর দেশলাইটা এগিয়ে দিলেন অনাদির দিকে। অনাদির সিগারেট ধরান হলে পর তিনি একটা সিগারেট নিয়ে টেবলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "আমি কিন্তু ও ব্যাপারে বড় হুসিয়ার। সস্তার সিগারেট বা বিড়ি আমি কিছুতেই খাইনা। বুঝলেন না, ওই টি, বি, রোগটাকে আমি বড় ভয় করি।"

টি, বি, কথাটা শুনেই অনাদি চমকে ওঠে। অজয়ের কি ব্যবস্থা হল কে জানে! কিন্তু সূর্য বলেছে, অজয়ের ব্যাপারটা সকলের কাছে জানাতে। সোজা হয়ে উঠে বসে অনাদি, "আচ্ছা, আজকে যে নতুন একজন আসামী এসেছেন, যাঁর স্ত্রী ভুগছেন টি, বি'তে, তাঁর কি ব্যবস্থা হল কিছু জানেন নাকি?"

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আপনারা তো ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছেন! এই তো এতক্ষণ আপনার ফাইল দেখছিলাম, এমন কিছু খারাপ রিপোর্ট পেলাম না আপনার সম্বন্ধে। কিন্তু আপনার এই আজকের

ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল কাল্। আপনি যে একজন কমিউনিষ্ট, এমন কোন রিপোর্ট আমরা পাইনি। আর রসময় সেনের পাত্তাতো আপনি জানেন না বলেছেন। কিন্তু আজ সকালে যে স্ট্যাণ্ড আপনি নিয়েছেন, তাতে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে সত্যিই আপনার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে কিনা!"

অনাদি বললে, "ও সম্বন্ধে নতুন করে বলবার আমার কিছুই নেই। যা কিছু বলার, সবই আমি কাল বলেছি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটায় যদি আমি একটু বিচলিত হয়ে থাকি, সেটা কি অন্যায়? অজয়বাবুর স্ত্রীকে দেখাশুনা করবার আর দ্বিতীয় লোক নেই, আর তাঁর এমন সামর্থ্যও নেই যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সে ক্ষেত্রে অজয়বাবুকে যদি আপনারা আটক করে রাখেন, তাহলে পরোক্ষে কি আপনারাই তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করছেন না?"

"এই তো, আপনার কথাগুলোই কমিউনিষ্ট মার্কা হয়ে পড়ছে—"

টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনাদি বললে, "ও কথা বলে আমাকে থামিয়ে দিতে পারবেন না। আমার কথার একটা উত্তর আপনাকে দিতেই হবে, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও—"

ভদ্রলোকের মেজাজটা যেন গরম হয়ে ওঠে, ঝাঁঝাল স্বরে প্রশ্ন করেন, "তাহলে হাঙ্গার স্ট্রাইক আপনি করবেনই?"

"নিশ্চয়ই, যদি না অজয়বাবুর দরখাস্ত মঞ্জুর হয়।"

"তাহলে নিশ্চয়ই আপনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য।"

"মোটেই না।"

"রসময় সেনের সঙ্গে একসঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং চড়াও করলেন, তবুও আপনি আমাদের বোঝাতে চান, আপনি তার পাত্তা জানেন না?"

"না।"

রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক, ভাবটা যেন বঁড়শিতে

গেঁথেও ডাঙ্গায় তুলতে পারছেন না। কতকটা যেন খেঁকিয়ে ওঠেন, "কিছুই তো জানেন না দেখছি, অথচ কুলোপানা চক্করওতো আছে!" হঠাৎ গুম্ মেরে গিয়ে হেঁকে ওঠেন, "দরোয়াজা—"

রামশরণ ঘরের মধ্যে ঢুকে বিড়ি আর দেশলাইটা রাখল টেবলের ওপর। ভদ্রলোক সেগুলো অনাদির দিকে ঠেলে দিয়ে, হাতে ফুঁ দিতে দিতে বললেন, "চা খাবেন নাকি ?"

অনাদি বললে, "তার আর দরকার হবে না।"

রামশরণকে ভদ্রলোক হুকুম দিলেন, "এক কাপ চা লাও—" তারপর আর একটা সিগারেট ধরালেন। পা দুটো চেয়ারের ওপর তুলে নিয়ে, পেছনে কাৎ হয়ে বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে 'রিং' ছাড়তে লাগলেন। রামশরণ এক কাপ চা নিয়ে এল। ভদ্রলোক চেয়ারের ওপর উবু হয়ে বসে টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরপর কয়েকটা মৃদু চুমুক দিলেন।

হন্তদন্ত হয়ে হেমবাবু ঢুকলেন ঘরে। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, "কি দাদা, আপনার আর কত দেরী ?"

ভদ্রলোক সখেদে বলে ওঠেন, "বুঝলেন হেমবাবু, আমাদেরই হয়েছে যত জ্বালা! ওপরওয়ালার কাছে থেকেও হুমকি শুনব আবার এঁরাও কথায় কথায় ছোবল মারবেন। চাকরী করতে এসে যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি!"

হেমবাবুর এখন খোস্ গল্প করার সময় নেই। বেগতিক বুঝে অনাদিকে বললেন, "তাড়াতাড়ি সেরে নিন অনাদিবাবু, আপনাকে আজ একটু সকাল সকাল রেখে আসতে হবে! আর হ্যাঁ, আপনাদের সেই অজয়বাবু—তিনি ছাড়া পেয়ে গেছেন—" সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দরজাটা ধরে ফেলে যেন সামলে নেন নিজেকে, "আর আপনাদের ওই কমরেড সূর্যবাবু, আপনার জন্যে কাপড়চোপড় রেখে

গেছেন। গাড়ীতে ওঠার সময়ে মনে করিয়ে দেবেন”—হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে যান হেমবাবু।

হঠাৎ অনাদির মনে পড়ে যায়, গতকাল বোধহয় এমনই সময়ে সে আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিল!

উনিশ

সপ্তম দিনে অনাদিকে লালবাজার লক্‌-আপ থেকে আনতে গিয়ে হেমবাবু বলে পাঠালেন, অনাদি যেন তার কাপড়চোপড়ও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এটা একটা ইঙ্গিত। সপ্তম দিনে যা হোক একটা হেস্তনেস্ত হবে, এইটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। হেমবাবু থেকে ইন্‌টারোগেটর বাবুরা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারেননি, অথবা বলতে চাননি, সপ্তম দিনেই অনাদির মেয়াদ শেষ কিনা। এতদিন অনাদি এই সপ্তম দিনটাকে তার মুক্তির দিন বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু আজ সুর্যর জামাকাপড় গোছাতে গোছাতে অনাদির মনটা হঠাৎ ওঠে দুলে—যদি তাকে পাঠিয়ে দেয় জেলে!

উতলা হয়ে ওঠে অনাদি, দেরী হয়ে যাবে—অনেক দেরী! দেরী হয়ে যাবে বাড়ী ফিরতে, দেরী হয়ে যাবে মোটামুটিভাবে জীবনটাকে খাড়া করে নিতে, আর অনেক দেরী হয়ে যাবে শান্তশিষ্ট বৌটার কাছে ক্ষমা চাইতে!

লরিতে উঠে অনাদি হেমবাবুকে প্রশ্ন করে,“কি অর্ডার এল হেমবাবু?”

ড্রাইভারকে গাড়ী হাঁকাতে বলে হেমবাবু বললেন, “অর্ডার এখনও এসে পৌছায়নি।”

এস্, বি, অফিসে এসে অনাদি ঢুকে বসল লক্‌-আপ রুমে। বেলা

একটা বাঙ্গলে চলল আই, বি, অফিসে। আজ যে সপ্তম দিন, এখানকার মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন, তার কোন লক্ষণই নেই কোথাও! আজও এলেন একজন নতুন ইনটারোগেটর, তিনিও সেই একই প্রশ্ন করলেন সময়বাবু সম্বন্ধে! সেই কেষ্টা তার বিখ্যাত টিফিন দিয়ে গেল যথাসময়ে। দিনগত পাপক্ষয় করে এক সময়ে ইনটারোগেটর বাবুও পড়লেন ঝিমিয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে গালে হাত রেখে আকাশ-পাতাল ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে গুটিগুটি গিয়ে বসলেন ক্যানটীনে! এদের জীবনে যেন কোন বৈচিত্র নেই, নেই কোন উৎসাহ, উত্তেজনা! অনাদির মনে হয়, এদের দিনকাল এমনি করেই বুঝিবা হঠাৎ একদিন থেমে যাবে হার্ট-ফেল্ করার মত!

কিন্তু অনাদির মধ্যে আজ অসহনীয় উৎকণ্ঠা! যা হোক একটা কিছু হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়—মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খা যেন সেই প্রথম দিনের মতই আকুল! তবুও সেদিন আর আজকের মত কত তফাৎ! গভীর অনুভূতিতে অনাদির ঠোঁটে ফুটে ওঠে ক্ষীণ হাসি। সে হাসি যেন বাড়ন্ত শিশুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে মায়ের হাসি।

বেলা পাঁচটার সময় হেমবাবু এসে দেখা দিলেন। ব্যস্ততার তাঁর আজও শেষ নেই। দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে বললেন, "চলে আসুন অনাদিবাবু, ঝট্‌পট্—"

চেয়ার ছেড়ে অনাদি উঠে দাঁড়াতেই হেমবাবু হাঁটতে সুরু করলেন। পেছন পেছন চলল অনাদি একেবারে অফিসঘরের ভেতর পর্যন্ত, সোজা গিয়ে দাঁড়াল একটা টেবলের ধারে। হেমবাবু সেই টেবলের বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই যে ইনি—এঁর অর্ডারটা দিয়ে দিন।"

মুখ না তুলেই প্রৌঢ় কেরাণী প্রশ্ন করলেন, "কি নাম?"

"অনাদি দাসগুপ্ত—"

একতাড়া কাগজের মধ্যে বিশেষ একটী কাগজকে খুঁজতে থাকেন

কেরাণীবাবু। অনাদি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কাগজটা হাতে পাওয়ার জন্যে আঙুলের ডগাগুলো নিস্‌পিস্ করতে থাকে। বার তিনেক বাণ্ডিলটার ওপর দিয়ে নোট-গোণার ক্ষিপ্রতায় আঙুল চালিয়ে খস্ করে টেনে নিলেন একখানা কাগজ। উপুড় করে সেটাকে টেবলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে ডেস্‌প্যাচ্ খাতা লিখলেন। খাতাটা এগিয়ে ধরে বললেন, "এইখানে একটা সই করে দিন।"

অনাদি বললে, "না পড়েই সই করব ?"

"পড়বেন আবার কি। রিলিজ অর্ডার—গুড্ লাক্ আপনার। নিন সই করে দিন—" ভদ্রলোকের যেন আর তর্ সয়না। সই হয়ে যেতেই কেরাণীবাবু কাগজটাকে আরও বার কয়েক নোট দেখার মত ঘষে ঘষে দেখে নিয়ে এগিয়ে ধরলেন অনাদির দিকে। এই প্রথম তিনি চাইলেন অনাদির মুখের দিকে। প্রৌঢ়ের হাত থেকে কাগজটা নিতে গিয়ে চোখোচোখি হয়ে যায়। চমকে ওঠে অনাদি, ও চাহনি যেন অতি পরিচিত—'আমার বকৃশিস্‌টা।' যুদ্ধের আগে কথাটা ছিল, 'আমরা কিছু পেয়ে থাকি'—দাবি জানালে আজকালকার লোক চটে যায়। কিন্তু বকশিস্ চাইলে মানুষে খুশী হয়। যুদ্ধের বাজারে আমেরিকানরা এই ভিখারীপনাটা চালু করে দিয়ে গেছে।

কাগজটা অনাদির হাতে পড়তেই আবার হেমবাবু হাঁটতে সুরু করলেন। অগত্যা অনাদি কাগজটা হাতে রেখেই হেমবাবুকে অনুসরণ করে। লক্-আপ্ রুমের সামনে তেঁতুল গাছটার তলায় এসে অনাদি বললে, "একটু দাঁড়ান হেমবাবু, অর্ডারটা একবার পড়ে নিই।"

হেমবাবুর কাছে অস্বস্তিকর হলেও রইলেন একটু দাঁড়িয়ে। দিনকাল এখন বদলে গেছে। পুলিশ হয়েছে পাবলিক সার্ভেণ্ট। দেশে এসেছে স্বাধীনতা। কোন মানুষের নাগরিক অধিকারে সরকার আর হস্তক্ষেপ করেন না।

উল্টে পাল্টে কাগজখানা পড়ে নিয়ে অনাদি জিজ্ঞেস করলে, "সাত দিন তো অফিসে যাইনি, এইটা দেখালেই হবে তো ?"

আমতা আমতা করে ওঠেন হেমবাবু, "সে কথা তো আমরা জোর করে বলতে পারি না। সেটা আপনার অফিসারের মর্জি।"

হাসি পায় অনাদির। মুচকে হেসে সে চেয়ে চেয়ে দেখে লক্-আপ্ রুমটার মধ্যে। মনে পড়ে হরিশকে, আনোয়ারকে, সূর্যকে আর অজয়কেও। লক্-আপ্ রুমের বাইরে বসে রামশরণ আর বৈজনাথ খেলছে বাঘবন্দী—এমনই মশগুল তারা, তার দিকে বারেক চোখ তুলে তাকাবারও অবসর নেই তাদের। সেই ইনফরমারবাবুটী গাছতলায় বসে নোট-বুকে কি যেন লিখছেন। সামনেই সেই অফিস, বেলা শেষে একটা টাইপ-রাইটার তখনও চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আর সেই কেষ্টা চায়ের কেটলি আর কাপগুলো নিয়ে ধুতে বসেছে।

হেমবাবু বললেন, "চলুন অনাদিবাবু, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—"

বিনয় সহকারে অনাদি বলে, "তার আর কোন দরকার হবে না হেমবাবু, আমি নিজেই যেতে পারব—" পা চালিয়ে দেয় অনাদি।

তবুও হেমবাবু অনাদির পাশে পাশে চলতে থাকেন। খানিকটা গিয়ে বললেন, "গেটটা আমি না পার করে দিলে তো আপনাকে বেরোতে দেবে না।"

চমকে উঠে অনাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হেমবাবুর মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে দেখে বলে, "ওঃ—"

চলেছে অনাদি ধীর মন্থর গতিতে। আর যেন কোন তাড়া নেই। সূর্যর দেওয়া জামাকাপড়ের বাণ্ডিলটা সে গুঁজে নিলে বগলদাবায়।

গেটের সামনে এসে হেমবাবু বললেন, "আচ্ছা, তাহলে নমস্কার—"

হাত তুলে অনাদিও নমস্কার করে। ব্যস্তসমস্ত হেমবাবু এতক্ষণে

ছাড়া পেয়ে দ্বিগুণ জোরে হন্‌হনিয়ে হেঁটে চলেছেন—এখনও তাঁর অনেক কাজ বাকী!

চলতে সুরু করে অনাদিও বারেক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাড়ীটার দিকে ফিরে। 'গ্রামের লোকে জনার্দন রায়ের বাড়ীর ত্রিসীমানা দিয়ে যায় না। কে নাকি কবে গিয়ে, অনেকগুলো মানুষের আর্তনাদ শুনেছিল, 'মরে গেলুম···মরে গেলুম!' অনাদির মনে হচ্ছে, সে-ও যেন শুনতে পাচ্ছে সেই একই আর্তনাদ। কমিউনিষ্ট পার্টির সাইন বোর্ড-খানা এখনও রয়েছে ওখানে আর রয়েছে পিপ্‌লস্‌ রিলিফ কমিটীর এ্যাম্বুলেন্স ভ্যানখানাও! লক্ষ মানুষের বাঁচার আকাঙ্খা দিয়ে গড়ে তোলা তাদের সংগ্রামী সংগঠণ আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও গলা টিপে ধরেছে এরা, ঠিক জনার্দন রায়ের মতই লোক চক্ষুর অন্তরালে এনে!

আবার চলতে সুরু করে অনাদি। মনে পড়ছে সাতদিন আগেকার ঘটনা—সে যেন কত যুগ আগেকার কথা! আর আজ সে মুক্ত! হঠাৎ অনাদির মনে হয়, পুলিশের কবল থেকে হয়তো সে সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি, কিন্তু মুক্তি পেয়েছে সে এই সমাজেরই বুকে অসংখ্য অদৃশ্য কালো কালো গরাদ দিয়ে ঘেরা কূপমণ্ডুকতার জেলখানা থেকে!

পায়ে পায়ে থিয়েটার রোড আর চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়ায় অনাদি। বাস, ট্রাম, মোটর চলেছে হুহু শব্দে! গতিশীল জীবনের প্রয়োজন যেন কোন অজান্তে বহুদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল তার থেকে। আজ যেন তার এগুলোকে দেখতেও ভাল লাগছে, আরও ভাল লাগছে ওর মধ্যেকার মানুষগুলোকে! বিশেষ করে ভাল লাগছে সেই মানুষগুলোকে, যারা এই গতির চালক। এতদিন যেন একটা আড়াল পড়ে গিয়েছিল ওই যন্ত্র আর তার চালক ওই মানুষগুলোর মধ্যে! তাই যন্ত্রকে তার মনে হত সভ্যতাবিধ্বংসী দানব! কিন্তু সুন্দর মানুষ যদি যন্ত্রকে চালায়।

গ্যাস পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিতে রাঙিয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর এতখানি আকাশ অনাদি অনেকদিন দেখেনি। মই কাঁধে খালি গায়ে একটা লোক এসে লাগায় তার মইটা গ্যাস পোষ্টের গায়ে, তর্‌তর্‌ করে উঠে যায় ধাপ কটা বেয়ে। গ্যাসের চাবিটা খুলে দিয়ে ঠুকে দেয় একটা দেশলাই কাঠি ম্যানটেল্‌টায়। আলো জ্বলে ওঠে। পূবের আকাশ থেকে যে অন্ধকার এসে জমা হচ্ছিল পৃথিবীর বুকে, অনাদির মনে হল, ওই মানুষটি আলো জ্বেলে সরিয়ে দিলে সেই অন্ধকার। বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অনাদি ওই মানুষটীর দিকে, কি বিপুল শক্তির আধার ওই মানুষটী।

ভারী ভাল লাগে অনাদির ওই মইওয়ালার আলো জ্বালা দেখতে। মইটা কাঁধে করে লোকটী ছুটে যায় আর একটা পোষ্টে—সেখানেও জ্বলে ওঠে আলো। তারপর আর একটা পোষ্টে—সেখানেও আলো। ওই মানুষটী যেন পৃথিবীর সমস্ত আঁধার ঘুচিয়ে দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছে আলোর মালা।

পার হয়ে নিলে অনাদি চৌরঙ্গির মোড়টা। হেঁটে চলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। ক্যাথেড্রাল রোড দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড—সেই পথে সে হেঁটেই বাড়ী ফিরবে। বগলের নিচে সূর্যর জামাকাপড়ের বাণ্ডিলটা আর একবার গুছিয়ে নিলে। তার মনে হল, এ সাহায্য সূর্য তাকে ব্যক্তিগত ভাবে করেনি। অজয়ের স্ত্রীকে বাঁচানর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই এসেছে সূর্যর কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিদান।

নির্জন পথ, ক্বচিৎ কখনও এক আধটা মোটর হুস্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনাদি হেঁটে চলেছে অনাবিল আরামে। মায়ের সমস্ত কথার মধ্যে একটী কথাই বার বার মনে পড়ছে, যে কথাটাকে সে এতদিন নিছক ভাবের উচ্ছ্বাস বলে মনে করেছিল। বার বার মা

বলেছেন, 'দরকার পড়লে ঘুঁটে দিয়েও খাব।' মায়েরও ওপর তাঁর আরও একটা সত্বা আছে, তিনি মানুষ—বোধহয় সেই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। চিনুও বলে সেই একই কথা, 'মেয়ে হলেও, আমি যে মানুষ, এইটাই আমি এদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব।' বোধহয় শান্তশিষ্ট বৌটীরও ওই একই কথা।

ক্ষণেকের জন্যে অনাদি নির্জন রাস্তার বুকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সোজা সামনে চেয়ে দেখে, আলোর বেষ্টনী যেন তাকে আলিঙ্গন করতে আসছে। অনুচ্চার কণ্ঠে অনাদি বলে ওঠে, "হ্যাঁ চিনু, বিয়ে আমাদের হবেই। আর কেউ পারবে না বাধা দিতে। এতদিন মনে ছিল, অগ্নিসাক্ষী করে তোমায় বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসব তোমাকে আমার ঘরে দাসি করে। কিন্তু, আর না, তুমি আসবে না দাসি হয়ে। তুমি আসবে আমাদের সাথি হয়ে—নতুন জীবনকে গড়ে তুলবার জন্যে অনেক লড়াই, অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের শপথ নিয়ে।"

এগিয়ে চলেছে অনাদি বাড়ীর দিকে, গতি তার উঠছে বেড়ে। হন্‌হন্‌ করে সে চলেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। মিন্‌মিনে ঘামে ভিজে ওঠা শরীরটায় হাওয়া লেগে শির্‌শির্‌ করছে। মনে পড়ছে অনাদির ও-বাড়ীর সকলকে। মনে পড়ছে তার শ্রীমন্তবাবুকে। পুলিশকে ভয় পাওয়া তাঁর অন্যায়টা কি। সাহস করে যে উনি এগিয়ে আসবেন, তাঁর নিরাপত্তা দেখবে কে! এ সমাজব্যবস্থায় সে প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই। তাই তো মানুষ কাপুরুষ হয়। শ্রীমন্তবাবুকে সে বুঝিয়ে বলবে, কাপুরুষ হয়ে বাঁচা যায় না।

মনে পড়ছে নির্মলবাবুর কথাও। এই মুহূর্তে যেন অনাদি শুনতে পাচ্ছে সেদিনকার সেই ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ, স্ত্রী আর ছেলে মেয়েকে চাপা গলায় ধমক দেওয়া। ছা-পোষা মানুষ নির্মলবাবু, একা চার পাঁচজনের

মুখে অন্ন তুলে দিতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যান। কিন্তু চোরের মত নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে উনি তো বাঁচতে পারবেন না!

এসে পড়েছে অনাদি গলিটার মোড়ে। বিড়ির দোকানটায় তখন চলেছে রেসের টীপ-এর বচসা। ঢুলুঢুলু আঁখি সেই বিড়িওয়ালার চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনাদি। ফেরার পথে ওর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। পকেট থেকে চারটে পয়সা বার করে গিয়ে দাঁড়াল দোকানের সামনে।

অনাদির মুখের ওপর চোখ পড়তেই বিড়িওয়ালার মুখখানা সস্মিত হয়ে ওঠে, "ক্যা, আ গয়া বাবু?"

অনাদি বললে, "হাঁ, আভভি আতা হ্যায়—"

"ঠিক্ হ্যায় বাবু, আ যব্ গয়া তব্ ঠিক্ হ্যায়—" কেমন যেন আপন মনেই ঘাড় নেড়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে বিড়িওয়ালা। টপ্ করে কি যেন মনে পড়ে যায় তার, পাশের লোকটার ওপর তম্বি করে ওঠে, "ক্যারে, উয়ো রোজ বোলাথা কি নহি—কম্যুনিষ্টোসে ওলোক নহি সেকেগা—" তারপর তার সহজ যুক্তি যোজনা করে দেয়, "দেখ্‌তো না, চীনমে ক্যা হো রহা—"

অনুসন্ধানি দৃষ্টি মেলে অনাদি বিড়িওয়ালার মুখখানা লক্ষ্য করে। কোন সন্দেহই তার থাকেনা, ওই মানুষটী সত্যিসত্যিই তার নিজের কথা বিশ্বাস করে। পয়সাটা ডেস্কের ওপর রাখতেই বিড়িওয়ালা বলে ওঠে "আজ রাখ্ দিজিয়ে বাবু, কাল্‌সে তো লেনেই পড়েগা! ইয়ে শালা কারবারসে কুছ নহি হোতা—"

বিড়িশুদ্ধ হাতটা পকেটের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে হাতটা আর বার করতে ইচ্ছে হয়না অনাদির, কি যেন এক গভীর আবেগের ছোঁয়া লেগে আছে তার হাতে! বাড়ীর সামনাসামনি এসে দেখে, ঘরে ঘরে জ্বলছে আলো, কেবল তার ঘরটাই অন্ধকার। অর্থপূর্ণ এক হাসিতে

মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইবার তারও ঘরে জ্বলবে আলো! হঠাৎ অনাদির মনে পড়ে যায়, তার ঘরের আলোটা বড় কমজোর! আটগণ্ডা পয়সা বাঁচানর জন্যে কিনেছিল একটা পঁচিশ পাওয়ারের বাল্ব। আলোটা কেমন যেন মিটমিট করে, রাতের বেলাতেও লালচে হয়ে থাকে! নাঃ, কালই ষাট পাওয়ারের একটা বাল্ব সে কিনে আনবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাতালটার ওপর থমকে দাঁড়িয়ে থাকে অনাদি। ওই তো, নির্মলবাবুর দুরন্ত ছেলেগুলো কান্নাকাটি করছে! ওই তো বায়না ধরেছে রঞ্জনবাবুর শান্ত মেয়েটাও। কেন তারা থাকবে ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে! তাদের জন্যে যে চাই অনেক জায়গা আর খোলা আকাশ!

কড়িকাঠের ফাঁকে একটা চড়াইপাখি ঝট্‌পট্ করে ওঠে। মুখ তুলে চাইতেই চোখে পড়ে, ইলেকট্রিকের খানিকটা তার ঝুলছে মাথার ওপর! ঠিক হয়েছে, আরও একটা জোরাল বাল্ব কিনে আনবে সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এই চাতালটার জন্যে। সন্ধ্যের পর বাচ্চারা এখানে করবে খেলা।

এমন একটা সুন্দর পরিকল্পনায় অনাদি খুশীতে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঝট্ করে মনে পড়ে শান্তশিষ্ট বৌটীর কথা—কড়া নাড়ে সজোরে।

দরজাটা খুলে যেতেই একরাশ আলো এসে পড়ে অনাদির মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়েছেন শান্তশিষ্ট বৌটী। ক্ষণেকের জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ঝপ্ করে বসে পড়ে অনাদি। তাঁর দুটী পায়ে হাত রেখে বলে ওঠে, "দিদি—আমি ফিরে এসেছি।"